বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

গণবিজ্ঞান–এ রাজ্যের অভিজ্ঞতা

মহারাষ্ট্রে বিজ্ঞানযাত্রা–কিছু প্রশ্ন

বিজ্ঞান ক্লাব–তাৎপর্য ও গুরুত্ব

যুদ্ধে মন-অস্ত্র

সেঁকো বিষ

সপ্তম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল 1984 এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সপ্তম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল1984

চিঠিপত্র □ গণবিজ্ঞান আন্দোলন—একটি ভাবনা ও কিছু অভিজ্ঞতা। রবীন চক্রবর্তী□বোম্বাই বিজ্ঞানযাত্রা। ব্রজমোহন অরোরা□টেকনিক্যাল এডুকেশন □ বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন—একটি পর্যালোচনা। দীপক কুমার দাঁ □ পরিক্রমা □ সেঁকো বিষের কললে পশ্চিমবঙ্গ। রবীন মজুমদার □ বইপত্র পরিচিতি□রিপোর্ট—ভারতের টেকনোলজি পলিসি। সূর্য কুমার নিয়োগী□

প্রচ্ছদ ঃ অতি দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
রবীন মজুমদার * রবীন চক্রবর্ত্তী * অভিজিৎ লাহিড়ী * সৌমেন গুহ * অসীম চট্টোপাধ্যায়

আমাদের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানসম্মত ভাবনার প্রসার □ বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা □ বিজ্ঞানের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্র ও অপপ্রয়োগের বিরোধিতা করা □ মানুষ সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা □ কাজের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক কাজের পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করা□

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় □ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার পাঁচ টাকা □ ডাক যোগে—সাত টাকা □ প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদা—পঁচিশ টাকা □ বাংলাদেশের জন্য—ভারতীয় টাকায় দশ টাকা □ বিদেশী গ্রাহকদের চাঁদা-বার্ষিক দশ ডলার □ এজেণ্ট কমিশন—দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ □ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-700012 ঠিকানায় দোতালায় ডি. এস. এণ্টারপ্রাইজের ঘর □ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, কলকাতা-700064

চিঠিপত্র

দেশ অভিমানী বিজ্ঞানীদের সেবা চায়

প্রফুল ভিদোয়াইর লেখায় "টেকনোলজি সিটির" উল্লেখ দেখিলাম। কিছুদিন যাবৎ দেশের মহান নেতাদের মুখে এই ধরনের জল্পনা-কল্পনা শুনা যাইতেছে। জানিনা কাজ কতদূর আগাইয়াছে। তবে যদি সেই অভিমানী কৃতি বিজ্ঞানী, যাদের সেবায় বঞ্চিত হইয়া দেশের এহেন দুরবস্থা, তাদের দেশে ফিরাইয়া আনিয়া পুনর্বাসন দিতেই হয়, তাহা হইলে অন্তত দুইটি বিষয়ের প্রতি সবিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই প্রায় সারা বছর ভ্যাপসা গরম। এই ভ্যাপসা আবহাওয়া প্রতিভা স্ফুরণের পক্ষে বড়ই বাধা। অতএব প্রস্তাবিত সিটি উপযুক্ত এলাকায় স্থাপন যুক্তিযুক্ত। তবে আঞ্চলিক ভাগাভাগির হিসেবের টানাপোড়েনে যদি উহা অস্থানে-কুস্থানে স্থাপন করিতেই হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই কৃত্রিম আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, 'সিটির' পারিপার্শ্বিক পরিবেশ 'সেইসব দেশের' অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় 'যেইখান' হইতে তাহারা আসিতেছেন। নতুবা 'হোম কান্ট্রির' জন্য নষ্টালজিক ফিলিংয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানীদের সহ-ধর্মীনীদের মানসিক ভারসাম্যের জন্যও এই আয়োজন জরুরী। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কানাই সরকার দুর্গাপুর

প্রবন্ধের আড়ালে বিজ্ঞান ধাঁধা

'বি-ও-বি'র জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'84 সংখ্যা পড়লাম। কার্টুন দুটি প্রবন্ধের বিষয়ের সাথে খুবই মানানসই হয়েছে। এগুলি মহারাষ্ট্রের লোকবিজ্ঞান সংগঠনের প্রচারিত পোস্টকার্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। এই স্বীকারোক্তি থাকলে ভাল হত বলে মনে করি।

প্রবীর রায় মহাশয় তার প্রবন্ধের মধ্যে একটি ধাঁধা পরিবেশন করেছেন। তিনজন ভারতবিখ্যাত বিজ্ঞানীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাদের নাম বলেননি। ভাবখানা যেন—বলুন তো পাঠক, কে হতে পারেন এই বিজ্ঞানীরা ?

আমি একটি সম্ভাব্য উত্তর লিখে পাঠাচ্ছি। প্রথমজন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্র ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর এক সময়ের প্রধান অধ্যাপক ভগবন্তম্। দ্বিতীয়জন কে ধরতে পারছি না। তৃতীয়জন অধ্যাপক সুদর্শন। যদি কোন পাঠক অথবা 'বি-ও-বি'র সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ধাঁধার সঠিক উত্তরটি এই পাতায় লিখে জানান তো খুশী হব। উত্তরের জন্য পরবর্তী সংখ্যা পত্রিকার দিকে চেয়ে রইলাম।

অবিনাশ ঘোষ ব্যাংগালোর

কিছু কথা

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1984 সংখ্যার বিভিন্ন রচনা পাঠ করার পর সংখ্যাটা প্রকাশের যৌক্তিকতা নূতন ভাবে উপলব্ধি করলাম। রচনাগুলোর বিষয়-বস্তুর মৌলিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশেষ ক'রে প্রবীর রায়ের লেখা 'ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক মন' এবং অভিজিৎ লাহিড়ীর লেখা 'বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস' প্রবন্ধ দুটোর স্বকীয়তা উল্লেখ করার মত। এ সত্ত্বেও সংখ্যাটার বিভিন্ন রচনার সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি (অবশ্যই ব্যক্তিগত অনুভূতিতে) উল্লেখ না ক'রলে সংখ্যাটার প্রতি যথোচিত আনুগত্য প্রকাশ করা হয় না।

প্রবীর রায়ের প্রবন্ধটাতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার তুলনা প্রসঙ্গে উনি 'মায়াবাদ' এবং 'কান্টীয় ভাববাদ'-এর উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে যে ঐ মতবাদ দু'টোর যদি একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থাকত তাহলে অন্তত বিজ্ঞানের যারা ছাত্র তাদের পক্ষে ঐ দুটো ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের পার্থক্য বুঝতে সুবিধা হত। প্রকৃতপক্ষে, মায়াবাদের প্রাধান্য ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের অনুপস্থিতি (যদিও এর মূল ঐ 'মায়াবাদ' নামক দর্শনের মধ্যেই নিহিত) বিজ্ঞানবিমুখ মানসিকতার এক প্রধান কারণ। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বেশীরভাগ সময়টাই কাটে গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে, যার থেকে বাইরের প্রকৃত জগৎটার বিস্তর ব্যবধান—অথচ তাঁদের ব্যবহারিক জীবনটা ঐ বাইরের জগৎটাকেই নিয়ে, যার ফলশ্রুতি বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ঘাটতি।

অভিজিৎ লাহিড়ীর প্রবন্ধে রামানুজন-এর মস্তিষ্কে গণিতের জটিল নিয়মগুলো কিভাবে উদয় হত তার কোন সদুত্তর নেই, ফলে যে কোন পাঠকই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে পারেন—ঘটনাটা অনেকের কাছেই অলৌকিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কি তাই ? ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না।

পরিশেষে, 'দৃষ্টিকোণ' এবং 'বিজ্ঞান প্রযুক্তি জীবিকা কোন পথে' শীর্ষক বিভাগ দুটো সংযোজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। **তুষার গঙ্গোপাধ্যায়** কলিকাতা

মন-অবদমন-দাসত্ব প্রসঙ্গে

আপনাদের পত্রিকার সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1983 সংখ্যাটি বেশ প্রয়োজনীয় এবং সুখপাঠ্য মনে হয়েছে। তবে গোটা পত্রিকার সার্বিক মূল্যায়নে না গিয়ে "মন-অবদমন-দাসত্ব" (যোগীন সেনগুপ্ত ও সুরঞ্জন কর)

প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রাখতে চাই।

প্রবন্ধটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এ ধরনের প্রবন্ধ অনেক বেশী প্রয়োজন এইজন্য যে এই প্রবন্ধ দাসত্বের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসন্ধান করেছে, আর্থ-নীতিক-রাজনীতিক গুরুত্বকে অস্বীকার না করেই। ঠিক এই সময়টাতে নির্দেশ্যবাদের (determinism) চোঁয়া ঢেঁকুর সর্বত্র—সেখানে এই প্রবন্ধ এই vulgurisation এর বিরোধিতা করে। কিন্তু প্রবন্ধটির মধ্যে কিছু রচনাগত দোষ আছে। প্রথমতঃ মানুষের নিস্পৃহতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক পরিবার-নারীমুক্তি, ব্রাহ্মণ্যবাদের closed-system, সাম্প্রদায়িকতা, মানবিক যৌনসম্পর্ক এবং ক্রিশ্চিয়ান চার্চ প্রভৃতি প্রসংগ আলোচনা করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ই অত্যন্ত ব্যাপক এবং তাদের আলোচনাক্ষেত্রও কিছুটা বিচ্ছিন্ন—ফলে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে ভাবনাচিন্তাগুলো দানা না বাঁধতেই এসে যায় অন্য একটি প্রসংগ। এর মধ্যে আবার এসে পড়েন রাইশ এবং গ্রামশ্চি—তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং ভূমিকা—গোটা লেখাটায় একটা সুতো গড়ে ওঠেনা। খুব বিক্ষিপ্ত ও অতি সরলীকৃত মনে হয় গোটা ব্যাপারটা। যেমন "গ্রামশ্চির উল্লেখযোগ্য অবদান হল যে তিনি লেনিনের রাষ্ট্রের তত্ত্বের একটি পরিপূরক মাত্রার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন"। একথা বলে গ্রামশ্চির "সিভিল সোসাইটির" যে ধারণা দেওয়া হয়, সেটি লেনিনের বহু রচনাতেই পাওয়া যায়। গ্রামশ্চির সাথে লেনিনের মূল পার্থক্যের জায়গাটা সুস্পষ্ট হয়না।

অন্যত্র গোটা আলোচনায় দুটি দিক নির্মমভাবে অবহেলিত থেকে গেছে। প্রথমতঃ পাভলভের "শর্তাধীন অবস্থার" কথা একবার উল্লেখ করা হলেও বিষয়টিকে আরো একটু মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিলো। দ্বিতীয়তঃ ব্যাপক উদাসীনতা নিস্পৃহতার ভিত্তির আলোচনায় মার্কসের বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব (Theory of alienation)-টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনপদ্ধতি, উৎপাদিত পণ্য, অন্যান্য শ্রমিক এবং সবশেষে নিজের থেকেই একটা শ্রমিক এই সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—এটা বুঝতে পারলে এই অবদমন-দাসত্বের Context-টা খুঁজে পাওয়া যায়।

তবে সবশেষে এ কথা অনস্বীকার্য, লেখাটির যে মূল উদ্দশ্যে, মানসিক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ধারাটির গুরুত্ব বোঝানো, সে হিসেবে লেখাটি ব্যর্থ নয়।

জয়ন্ত ঘোষাল, মৃদঙ্গ, শিবপুর হাওড়া-2

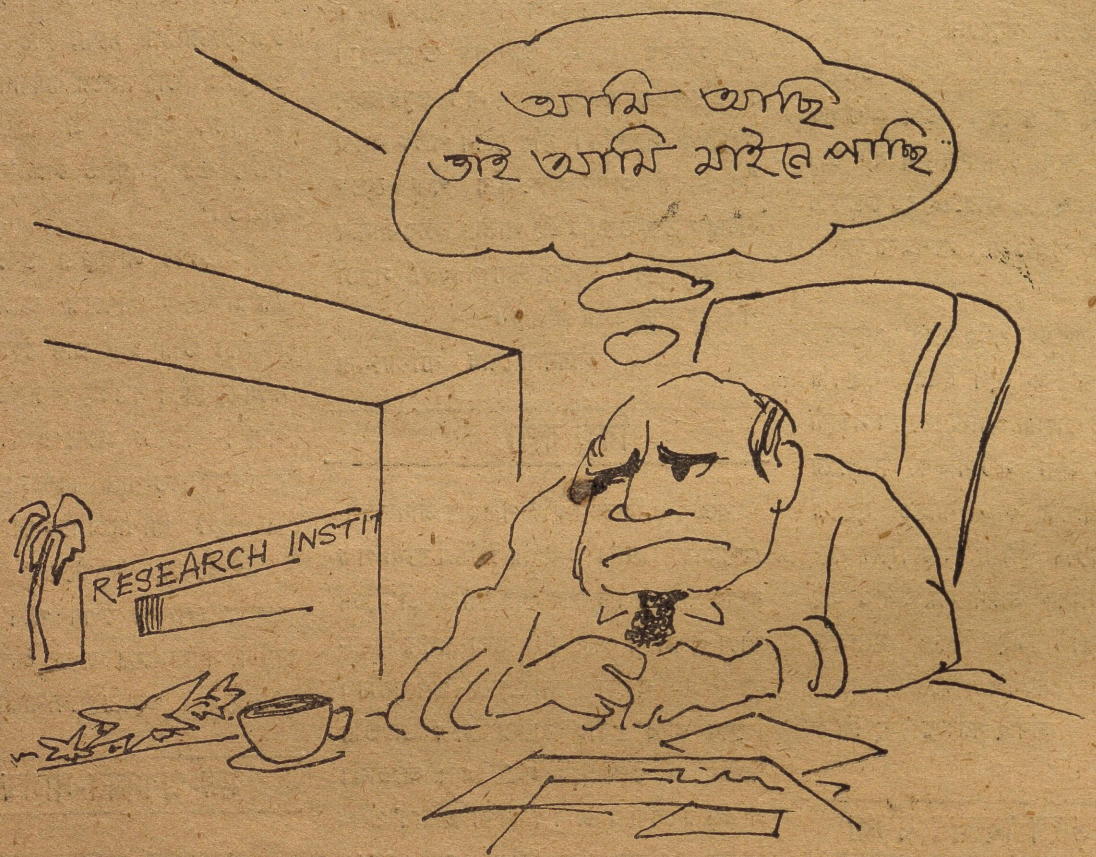

দেকার্তে বলেছিলেন—"আমি ভাবছি, তাই আমি আছি"

এ রাজ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের কর্মীরা, আমাদের খুব কাছের কিছু মানুষজন, পরস্পরের সাহচর্যের ভিতর দিয়ে শুরু করতে চেয়েছে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ। তাদেরই আশা-নিরাশা, উদ্যোগ, ব্যর্থতা, দ্বন্দ্বের আন্তরিক মূল্যায়ন।

গণবিজ্ঞান আন্দোলন—

একটি ভাবনা ও কিছু অভিজ্ঞতা

রবীন চক্রবর্তী

বিজ্ঞানের আগে 'গণ' বসিয়ে গণবিজ্ঞান কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে সম্প্রতি। কিছু কিছু কাজও হচ্ছে। এ নিয়ে আন্দোলনের কথা বলছেন অনেকে। 'লোকবিজ্ঞান', 'প্রগতিবার্তা', 'উৎস মানুষ', 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র পাঠকরা জানেন সে কথা। খুব অল্প দিন শুরু হয়েছে কাজ। অভিজ্ঞতা সীমিত। এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে গোটা প্রয়াস। কাজের শরিক মূলত ছোট ছোট বিজ্ঞানসংস্থা, পত্র-পত্রিকাগোষ্ঠী, কিছু যুব-ছাত্র সংগঠন। যার মধ্যে সাংস্কৃতিক সংস্থা আছেন, সেবামূলক সংস্থা আছেন, স্বাস্থ্যকর্মী আছেন এবং আছেন বেশ কিছু উৎসাহী ব্যক্তি যাদের অন্য কোন সাংগঠনিক পরিচয় নেই।—যারা মনে করেন একা একা নয়, প্রয়োজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াস। তারই উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এখনও পর্যন্ত গোটাকয়েক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছাড়া বিশেষ কিছু করা যায়নি। লোকজন ডেকে খুঁজে আনতে হচ্ছে। কিছু শিক্ষিত ছাত্র যুবক উৎসাহী হয়েছেন সবেমাত্র।

এমন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলেই অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে সচেষ্ট। সকলের অভিজ্ঞতা সমান নয়।—স্বভাবত সিদ্ধান্তও। কেউ কেউ প্রচুর সম্ভাবনা দেখছেন এই প্রয়াসের মধ্যে।—অনেকে হতাশও। গতানুগতিক ছকে কাজ হচ্ছে না। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র হয়েছে—তাকে ঘিরে কোন সংগঠন হয়নি। সংগঠনের কাঠামো গড়ে ওঠেনি—হয়নি সভাপতি, সম্পাদক বা অনুরূপ নেতৃত্ব। ফলে নবীন অনেকে এই স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছেন, অনেকে দেখছেন বিশৃঙ্খলার বীজ। টানাপোড়ন চলছে। সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সকলেই সচেষ্ট এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে। এই লেখা সে কথা মনে রেখেই। তবে লেখা সীমাবদ্ধ রাখছি বাস্তবতঃ যা হয়েছে তার মধ্যেই। কি হওয়া উচিত ছিল তার মধ্যে যাইনি।

বিজ্ঞান নয় গণবিজ্ঞান কেন

অনেকের মনেই খট্‌কা, বিজ্ঞান নয়, গণবিজ্ঞান—কেন? বিজ্ঞান তো মানবকল্যাণেই নিয়োজিত। তবে আর 'গণ' শব্দের বাহুল্য কেন? স্বাভাবিক এই প্রশ্ন। কারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে গণমানসে যে 'ইমেজ' গড়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ প্রকাশ করলে খট্‌কা লাগে বৈকি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে উদ্দেশ্যে যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে এই প্রশ্ন ক্রমে প্রকট হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান নামক গোটা কর্মকাণ্ডটাই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি কসরৎ বলে মনে হচ্ছে। আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা রাষ্ট্রশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যাশা জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে এই বিজ্ঞান। কিন্তু এটা স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। ক্রমাগত স্তুতিবাক্য ছাড়া জুটছে না কিছুই।

পাশ্চাত্য দেশের বহুদিনের চর্চায় অর্জিত কিছু জ্ঞান ও প্রযুক্তি হঠাৎ পেয়ে গেছি আমরা। যা দেশের বেশীরভাগ মানুষের ভাবনা চিন্তা ঐতিহ্য ও জীবনযাপনের ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে অল্প কিছু মানুষ এর সুফলটুকু ভোগ করছে। এদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা। এদের জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে নিংড়ে উপভোগ করছে জীবনের রস। বাদবাকী মানুষ দর্শকমাত্র। তারা খাদ্য পানীয় বাসস্থান চিকিৎসার মত সাধারণ সমস্যার মোকাবিলা করে চলেছেন সাবেক পদ্ধতি ও হাতুড়ে জ্ঞান সম্বল করে। আর 'মানব কল্যাণে নিয়োজিত (!) বিজ্ঞানের' ইমারত গড়ে উঠছে স্বচ্ছন্দ্য জীবনের অধিকারী মানুষদের ভাবনা ও সমস্যার উপযোগী করে। যার লক্ষ্য নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা এবং রাষ্ট্রের শক্তি আরও সংহত করা।

স্বভাবতই এই ইমারতের সাথে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত কিছু মানুষ এই অনৈক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বোধ করছেন। প্রতিবাদ করতে চাইছেন। এই ভাঁওতার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে চাইছেন। কারণ জাগ্রত জনমতই এই কর্মকাণ্ডকে জনমুখী করতে পারে।

এই অবস্থায় 'বিজ্ঞান' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট 'ইমেজের' বাধা এড়াতে বিকল্প নামকরণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন অনেকেই। এটা সেটা বলতে বলতে একসময় চালু হয়ে গেছে এই নাম—গণবিজ্ঞান। তা থেকে গণবিজ্ঞান আন্দোলন। তবে স্বীকার করতেই হবে এই নামকরণ পর্বে ইংরেজীতে ব্যবহৃত দু'একটি নাম যেমন 'পিপল্‌স সায়েন্স', 'সায়েন্স ফর দি পিপল্'-এর স্মৃতি মগজে কাজ করেছে নিশ্চই।

কাজ কিভাবে শুরু হল

কিভাবে শুরু হয়েছিল কাজ স্মরণ করলে বর্তমান পর্যায়ের মূল্যায়ন সুবিধা হবে। ছোট বড় বিজ্ঞান ক্লাবের ভীড়ে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছিল

কিছু সংস্থা, যারা মনে করত না শুধু বিজ্ঞান আলোচনা ও কিছু হবি-চর্চাই যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার সূচীমুখ নির্দ্ধারিত হয় এরই ভিত্তিতে। এই প্রশ্নে নীরব থেকে মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের বাণী আওড়ানো আর মাটির পুতুলের সামনে 'ধনং দেহি রূপং দেহি...' বায়না করা একই কথা।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু কিছু কাজের চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু পারা যাচ্ছিল না নিজেদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের জন্য। এই অবস্থায় তেমন কিছু সংগঠন নিজেদের খণ্ডিত সম্বলকে একত্রিত করার কথা ভাবলেন। তবে প্রথাগতভাবে নয়। অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়া নয়। অথবা মাথার উপর একটি ছাতা গড়া নয়। শুধুমাত্র সবার সম্বলগুলি একত্র করার চেষ্টা হল। সম্বল বলতে কারো স্লাইড সেট, কারো পোস্টার, কারো পত্রিকা বা কারো শুধুই লোকবল। ঠিক হল যেকেউ এগুলি ব্যবহারে লাগাতে পারবেন। ফলে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কাজের বাধা রইল না। অথচ পারস্পরিক সহযোগিতার আশ্বাসের ভিত্তিতে একটি common resource pool গড়ে উঠল।

সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজের শুরু

অচিরেই কাজ শুরু হল নতুন ভাবনার আলোকে।—এখন থেকে বছর আড়াই আগে। বেলেঘাটার খালধারে শ্রমিক বসতি এলাকায় "আগামী সংস্কৃতি" অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। ই.সি.এস.সি.ও. গেল পোস্টার নিয়ে। পি.এস.এ. এবং পি.এইচ.এস.এ'র পক্ষ থেকে ওই এলাকায় স্বাস্থ্য সমীক্ষার কাজ হল। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা 'পানীয় জলের দূষণ' ও 'সূর্যগ্রহণ' বিষয়ে স্লাইড দেখিয়ে এল। ব্যারাকপুরের একটি সংস্থা গান গাইল। হাওড়ার একটি সংস্থা নাটক করল। উৎস মানুষে সেই রিপোর্ট ছাপা হল। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে প্রকাশিত হল "আগামী সংস্কৃতি"র বিশদ পরিচিতি। এইভাবে শুরু হল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে কাজ। এরপর অনুরূপ অনুষ্ঠান হতে থাকল অন্যত্রও। কাঁচড়াপাড়ায়, বর্দ্ধমানে, খড়্গপুরে, সোনারপুরে, কল্যাণীতে।

কাজের ধারা নতুন কিসে

এইভাবে গড়ে উঠল নতুন একটি কাজের ধারা। নতুন বলছি এই-রকম সহযোগিতার মনোভাবের দরুন। অপরের উদ্যোগ আয়োজনে আর সকলের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নতুন বৈকি। ফলে অনেকের পক্ষেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হল। এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে—দূরবর্তী এলাকার কিছু মানুষ পত্রিকা বা অন্য মারফতে জেনেছেন এধরনের আশ্বাসের কথা। সেইমত উদ্যোগ নিয়েছেন অনুষ্ঠানের, দিন ঠিক করেছেন—তারপর আমাদের জানিয়েছেন সে কথা। সম্ভাব্য সহযোগিতা করেছেন সকলে। সম্বল আমাদের সামান্য। নতুবা আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত এই কাজের ধারা।

কারা আসছেন এই কাজে

এই উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য দিক হল বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ও ব্যক্তির অংশগ্রহণ। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের মানুষ উৎসাহী হচ্ছেন। বিজ্ঞানের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থের যে বিরোধ থাকতে পারে একথাটাই অনেকের কাছে নতুন। অল্প গুটিকয়েক সংস্থা এই মর্মে বিতর্ক জিইয়ে রেখে আসছিল এতদিন। যেমন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা দীর্ঘ আট নয় বছর যাবৎ এ বিষয়ে প্রচার চালিয়ে আসছে বিভিন্ন আলোচনা-সভা ও পত্রিকার মাধ্যমে। আজ তা আন্দোলনের রূপ নেওয়ার অপেক্ষায়। কারণ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ বুঝতে শুরু করেছেন বিষয়টি। স্কুলের শিক্ষক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-গবেষক, ডাক্তার, হাসপাতালকর্মী, ব্যাঙ্ক ও অফিসকর্মী, কারখানার শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার, তরুন সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, রাজনৈতিক কর্মী। সংখ্যায় বেশী নন এঁরা। তবে পেশাগতভাবে এই ভাবনা ছড়িয়ে দিতে পারলে কাজের ক্ষেত্রে একধাপে অনেকখানি বিস্তৃত হবে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে জানাই বিজ্ঞান ক্লাবগুলির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে অনেকেরই চিন্তা ভাবনা সম্প্রতি এই খাতে বইতে শুরু করেছে। এদের অনেকেই আমাদের পোস্টার, স্লাইড নিয়ে অনুষ্ঠান করছেন।

কি বলা হয়

প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু তৈরীর ব্যাপারে পরিকল্পনামাফিক কাজ হয়নি। বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গ্রুপগুলি তাদের ভাবনা চিন্তা ও রুচি অনুযায়ী তৈরী করেছেন সব। স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত সব বিষয়বস্তু। তবে বৈশিষ্ট্যহীন নয়। প্রাত্যহিক জীবনের হাজারো ঘটনা থেকে সঠিক ও উপযোগী বিষয় বাছাইয়ের কাজটিও উল্লেখযোগ্য কাজ।

এখনও পর্যন্ত প্রদর্শিত বিষয়ের মধ্যে আছে বন্যা, খরা, ভূত-প্রেত, ওঝা, ঝাড়ফুক, জ্যোতিষ, তাবিচ, রত্ন-আংটি, সূর্যগ্রহণ, ব্রহ্মাণ্ডপরিচয়, সাপ, কুকুরের কামড়ের চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ওষুধ, মদভাঙ নেশা, পানীয় জল, পরমাণু যুদ্ধ, পরিবেশ দূষণ, ইত্যাদি। বোঝাই যায় বিষয়-বৈচিত্র্যে ঘাটতি নেই। তবে এর সব কটাই খুব গভীর ভাবে ভাবনা চিন্তা করে করা হয়েছে এমন নয়। নতুন কাজে প্রাথমিক উত্তেজনার কারণেই হয়ে থাকবে এমনটি।

বিষয় নির্বাচনের ধরন থেকে অনুমান করতে পারেন কি আমাদের লক্ষ্য। জীবনের ছোট বড় ঘটনা বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই আমরা। সেখানে দেখি কুসংস্কারের ঘন অন্ধকার কিভাবে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজ্ঞানের বিপুল জ্ঞানভান্ডার মানুষের করায়ত্ত থেকেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাবে আজও কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয় প্রায়শই। আধিপত্যকামী রাষ্ট্রনায়কদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা কিভাবে

ব্যবহৃত হন মারণাস্ত্র নির্মাণকার্যে। কারখানা ও শিল্প মালিকদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতায় মানব পরিবেশ কিভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। চিকিৎসার নামে মুনাফালোভী ওষুধ ব্যবসায়ীদের ব্যাভিচারের মাত্রা কিভাবে বেড়ে চলেছে। ইত্যাদি। এইসব দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমরা আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জনবিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যথার্থ জনকল্যাণকর কাজে প্রয়োগ করার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলি।

কিভাবে বলা হয়

মূলত পোস্টার ও স্লাইডের মাধ্যমে বলা হয় এসব। পরীক্ষামূলক ভাবে নাটক ও কবিগানের মাধ্যমেও চেষ্টা হয়েছে। পরমাণু যুদ্ধ বিরোধী নাটক "পিকাদন" সকলের প্রশংসা পেয়েছে। এটি করেছে 'পথসেনা' নামে নাট্যগোষ্ঠী। কবিগানের মাধ্যমে সাপের কামড়ে নতুন ও পুরনো দুই পদ্ধতিতে চিকিৎসার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তৈরী করেছে কাঁচরাপাড়ার 'বিজ্ঞান দরবার'। গ্রাম বাংলায় কবি গানের আবেদন আজও অব্যাহত। তাই কবি গানের নামে বহুলোক আকৃষ্ট হয়েছেন আমাদের অনুষ্ঠানে। তবে অনুষ্ঠান আরও উন্নত মানের না হলে অভ্যস্ত এই শ্রোতাদের প্রশংসা পাওয়া শক্ত। ম্যাজিকের মাধ্যমটিও খুবই আকর্ষনীয়। —বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ে অন্ধবিশ্বাস ভাঙতে ও গুরুবাবাজীদের ভেল্কি ফাঁস করতে খুবই কার্যকর এই পদ্ধতি। প্রথমে বাবাজীদের মত করে ভেল্কি দেখানো।—তারপর তার কায়দা লোকের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা। চাই কি দু'একজনকে ধরে শিখিয়েও দেওয়া। এতে খুব কাজ হয়। পরে আপনা থেকে প্রচার হতে থাকে। কিছু কিছু ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে থাকি আমরা। যেমন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য সীমার নীচের বস্তুজগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করি। রোগের জীবাণু, দেহের রক্তকণিকা, ইত্যাদি দেখায় লোকের যথেষ্ট আগ্রহ। টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে চাঁদের পিঠ বা শনির বলয় দেখতে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়াতেও রাজী লোকে, তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা।

এইসকল মাধ্যমগুলি এখনও ব্যাপকহারে ব্যবহার করা যায় নি। লোকবলের অভাব এজন্য অনেকটা দায়ী। আগামী দিনে আরও কিছু কিছু মাধ্যম ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল কাটা, পোড়া, জলেডোবা, ইলেক্ট্রিক শক, ইত্যাদি অসুস্থতায় প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারটা অভিনয় করে দেখানো।

ফিল্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। আমরাও মাঝেমধ্যে ফিল্ম দেখিয়ে থাকি। তবে মনোমত ফিল্ম পাওয়া শক্ত। পেলেও তা ইংরেজী ভাষায় তৈরী। তাই স্লাইডের মত—নিজেদের ফিল্মও দরকার। Super-8 ফিল্মের নো-হাউ আমাদের বন্ধুদের আছে। আর্থিক সংগতির অভাবে তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তবুও এরই মধ্যে আমাদের বন্ধুরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে গোটা কয়েক ফিল্ম করেছেন। যেমন—গ্রামবাংলার জ্বালানী সমস্যা এবং খরা নিয়ে।

অনুষ্ঠানের ধরন-ধারন

অনুষ্ঠানের ধরন মূলত দুরকম। আঞ্চলিক উদ্যোগে অনুষ্ঠান এবং সমবেত উদ্যোগে অনুষ্ঠান। আমাদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেন অনেকে। সেক্ষেত্রে তাদের উৎসাহিত করা হয় বক্তব্য রাখা থেকে আরম্ভ করে পুরো কাজটাই নিজেদের করতে। সেজন্য পোস্টার ও স্লাইডের বিষয়বস্তু তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় আগেই। প্রজেক্টর, স্লাইড, মাইক্রোস্কোপ যা লাগে তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য skill, specialisation, professionalism ইত্যাদি সম্পর্কে অহেতুক myth ভাঙ্গা।

আর একটি ধরন হল সমবেত উদ্যোগ। সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক হিসেবে অনুষ্ঠানের এলাকার দু'একটি সংগঠন থাকেন। মূল অনুষ্ঠানের জন্য অন্য সকল সংস্থা তাদের প্রোগ্রাম নিয়ে সেখানে হাজির হন। এ পর্যন্ত বর্ধমানে, কলকাতায়, মেদিনীপুরে এবং দুর্গাপুরে এধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ ধারা গড়ে উঠছে। দিনের বেলায় হাতে পোস্টার, মুখে গান ও শ্লোগান সহ মিছিলের পর্ব। সন্ধ্যায় গান, বক্তৃতা, স্লাইড শো, ফিল্ম, নাটক নিয়ে দ্বিতীয় পর্ব। এর সাথে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে থাকে পোস্টার পত্রপত্রিকা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী।

মেদিনীপুরের অনুষ্ঠান ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানে দিন কয়েক ধরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করা হয়েছে—সমবেতভাবে। স্থানীয় মানুষজনের সাথে আগেই যোগাযোগ করে কিছু প্রচার ও ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া ছিল। স্কুল প্রাঙ্গণে, হাটে-বাজারে, হলঘরে এই সব অনুষ্ঠান হয়েছে। লোকজন কম হয়নি। অনেক সময় মনে হয়েছে—এতখানির জন্য আমরাই প্রস্তুত ছিলাম না।

মানুষজন শুনছেন কতটুকু

হাটে বাজারে হঠাৎ অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রথাগত পদ্ধতিতে মঞ্চ সাজিয়ে অনুষ্ঠান করলে লোকজন আসেন বেশী। গ্রামের দিকে গানের চেয়ে নাটক কবিগানে আগ্রহ বেশী। পোস্টার সাজিয়ে রেখে দিলে যত লোক আকৃষ্ট হন—কেউ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝিয়ে দিলে অনেক বেশী লোক শোনেন। ছাপানো পোস্টারের চেয়ে হাতে আঁকা ও লেখা পোস্টার লোকের নজর কাড়ে বেশী। সিনেমা দেখানো হবে বললে তো কথাই নেই—লোক জমানো কোন কষ্টই নয়।

অল্প সময়ের যোগাযোগ যথেষ্ট নয়

লিখতে বসে এতো গুছিয়ে লিখলেও কার্যক্ষেত্রে সব ঠিকঠাক হয় এমন নয়। অনেক সময়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে আমাদের উদ্দেশ্যটা ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ফলে আর পাঁচটা অনুষ্ঠানের মত

ক্ষণিকের বিষয় হয়ে পড়ে। আর আমরা চাই এই অনুষ্ঠানের সূত্রে যে যোগাযোগ স্থাপিত হল—তাকে স্থায়ী করা। নতুবা ক্ষণিকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর তাৎপর্য স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব নয়। এটা বুঝলেও এখনো আমাদের চর্চার মধ্যে তার ছাপ পড়েনি। আসলে অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজেই সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। স্থানীয় লোকের সাথে যোগাযোগ দৃঢ় করা ভবিষ্যতের কর্মসূচী বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনভাবে কোন পরিকল্পনাই নেওয়া হয় না। এছাড়া এত অল্প সময়ের পরিসরে নতুন পরিবেশে প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সম্পর্ক সহজ করে নেওয়ার ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে গ্রাম শহরের মানুষের মানসিকতায় ব্যবধান তো আছেই। এব্যাপারে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে বুঝছি। আমাদের আচার পোষাক পরিচ্ছদ মুখের ভাষা কথার ভঙ্গি সবেরই সংস্কার দরকার।

অনেকের মত এগিয়ে আসছেন—সরকারও

ব্যাঙ্কের কর্মচারী ইউনিয়নে অথবা কারখানার শ্রমিক সংগঠনের অনুষ্ঠানে আমাদের পোস্টার স্লাইড চেয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুল কলেজ ও কিছু কিছু সমাজসেবী সংস্থার কাছ থেকে আবেদন আসছে স্লাইড দেখাবার। পুজো, বা অনুরূপ ছুটি-ছাটায় পাল্টা অনুষ্ঠান করছেন অনেক বন্ধু। পোস্টার ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সাথে বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের স্টল দেওয়া রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। এগুলি গণউদ্যোগ। আবার সরকারের পক্ষ থেকেও বিষয়টি অবহেলা করা হচ্ছে তা নয়। — যুব উৎসবে ঘটা করে বিজ্ঞান মেলা ও বক্তৃতামালার আয়োজন হচ্ছে। মডেল প্রতিযোগিতা হচ্ছে রাজ্যব্যাপী দেশব্যাপী। বিচারের মানদণ্ডে গণসচেতনতার প্রশ্নটি বিবেচিত হচ্ছে কখনোসখনো।

রাষ্ট্র কেন এমন কাজ করবে

বিজ্ঞান প্রচারের কাজটি রাষ্ট্রও চায়—নিজের স্বার্থেই। প্রথমত বিজ্ঞাপনের মূল্য তো আছেই। তাছাড়া আর একটি দিকও আছে। সমাজের কোন ক্ষেত্রে জনপ্রিয় গণউদ্যোগ দেখলে রাষ্ট্র আগ বাড়িয়ে সেখানে অগ্রণী ভূমিকা নেবার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের 'ইমেজ' গড়া। আর কিছু পয়সা-কড়ি ছড়ালে চিন্তা ভাবনার খাতকেও কিছুটা প্রভাবিত করা যায়। সেটাও কম লাভ না।

হোক। তবু তারা এগিয়ে আসুন। কারণ তাদের উদ্যোগ আকারে বড় হতে বাধ্য। ফলে প্রচারের কাজটি হয় দ্রুত। এই মুহূর্তে বিজ্ঞান প্রচারের কাজটিও জরুরী।

নতুন উদ্যোগ—তথ্যকেন্দ্র

আমাদের আর একটি উদ্যোগের কথা বলি। সম্প্রতি গড়ে উঠেছে Documentation Centre। নাম 'জনবিজ্ঞান জনস্বাস্থ্য তথ্য কেন্দ্র'। বেলেঘাটা সি. আই. টি'র মোড়ে 'প্রসেনজিৎ স্মৃতি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে' আপাতত চলছে এর কাজ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পত্র পত্রিকা বই বুকলেট রিপ্রিন্ট ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ চলছে। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি নতুন দিক সূচিত হল। বলা যায়, লক্ষ্য যে কিছু দূর ভবিষ্যতের দিকেও প্রসারিত তার ইঙ্গিতবহ এই উদ্যোগ।

জবাবদিহি

গোটা লেখাতেই সমস্ত মতামত 'আমাদের' বলে চিহ্নিত করেছি। যদিও এই 'আমরা' বলতে কাদের বুঝিয়েছি উল্লেখ করিনি। মতামতগুলি একান্তই নিজস্ব। তবুও 'আমাদের' ব্যবহার করেছি, এর সাথে সহমত পোষণ করেন এমন যদি কেউ থাকেন তাদের কথা মনে রেখে। ভিন্ন মত পোষণ করতেই পারেন অনেকে। সেক্ষেত্রে তাদের মতামত ভবিষ্যতে এর পাতাতেই জানার আগ্রহ রইল।

ঘাটতির শেষ নেই

এত কথার আড়ালে আমাদের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার প্রশ্নগুলি আড়াল করা উদ্দেশ্য নয়। আসলে প্রত্যাশামত কিছুই করা যায়নি। তাবলে হতাশার অতলে এই উদ্যোগের বৈশিষ্টগুলি হারিয়ে যাক চাইছি না—তাই উল্লেখ করলাম যা হয়েছে সেটুকুই। অনেকে মনে করছেন সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে মনোমত কাজ হচ্ছে না। জানিনা হতেও পারে। তবু সবাই নিজস্ব ঢঙে কাজ গড়ে তুলুন চাইছি। নিজেরা পোস্টার স্লাইড তৈরী করুন। একইভাবে কাজ ছড়িয়ে দিন চারধারে। অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও পারস্পরিক ভাবনাচিন্তার আদান প্রদানের একটি কার্যকর প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে পারলে এই অসুবিধা থাকবে না বলেই অনুমান। এ কাজটিই করা যাচ্ছে না। তাই এত আশঙ্কা।

তবে হতাশ নই

ভাবনা ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট না হলেও একটি প্রক্রিয়া কাজ করছে টের পাচ্ছি। মূলতঃ আমাদের বন্ধু মনোভাবাপন্ন পত্রিকা ক'টির মাধ্যমেই তা হচ্ছে। যদিও এখনও সুষ্ঠু রূপ পায়নি তা। আজ বর্ধমানের মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শ্লোগান উঠল—"বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায় বন্দী করে রাখব না", তাই যখন মাস খানেক বাদে নদীয়া কিংবা উত্তরবঙ্গের কোন বিজ্ঞান পদযাত্রায় ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে দেখি তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হলেও নিঃসঙ্গ নই বিশ্বাস জাগে মনে। ছড়িয়ে থাকলেও আশ্বস্ত হই আমরা প্রায় একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভাবনার কাছাকাছি আছি। শুধু এই বিচ্ছিন্ন অবস্থানের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ গড়ে তোলার অপেক্ষা। তাহলে আগামী দিনে গণবিজ্ঞানের ভাবনা গঠন-মূলক যুব আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। □

বিজ্ঞান পদযাত্রায় আপাত সাফল্য পাওয়া গেছে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এতে সত্যিই কতটা বদলাচ্ছে মানুষের মানসিক গঠন? মহারাষ্ট্র লোকবিজ্ঞান সংগঠনের বিশেষ প্রতিবেদন।

বোম্বাই বিজ্ঞান যাত্রা

ব্রজমোহন অরোরা

1982 সালের অক্টোবর মাসে লোকবিজ্ঞান সংগঠন আয়োজিত মহারাষ্ট্র বিজ্ঞানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ থেকে শুরু হল এমন এক গণ-আন্দোলন, যার প্রধান লক্ষ্য সমাজের সর্বস্তরে—বিশেষত নিরক্ষর এবং অর্ধশিক্ষিত অংশের মধ্যে—বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো। এই 'যাত্রা' উপলক্ষ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রের বিভিন্ন মানুষ—বিজ্ঞানী, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং অন্যান্যরা—পারস্পরিক সান্নিধ্যে এলেন। যাত্রার বিবিধ অনুষ্ঠানে নাটক, গান, দেয়ালচিত্র, মডেল, ফিল্ম, স্লাইড ইত্যাদি নানা মাধ্যম ব্যবহার ক'রে মানুষের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সংগে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে বহু ব্যক্তি তাঁদের জীবন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হবেন—বিজ্ঞান তাঁদের কাছে রহস্যমুক্ত হয়ে উঠবে এবং বিজ্ঞান ও জনসাধারণের মধ্যের দূরত্ব হ্রাস পাবে; এছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণাক্ষেত্র এবং সংগঠন থেকে আগত কর্মীরা এতে অংশ গ্রহণ ক'রে আমাদের সমাজের বিবিধ বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। মহারাষ্ট্র বিজ্ঞান যাত্রার এক উল্লেখযোগ্য নতুন আবিষ্কার—'বিজ্ঞান গপ্পো' অর্থাৎ এক খোলাখুলি প্রশ্নোত্তর, আলাপ-আলোচনার আসর। এই আসরগুলিতে উপস্থিত লোকেরা স্বাস্থ্য, জল, মৃত্তিকা, খরা প্রভৃতি বিজ্ঞানমূলক যে সব বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে—তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলেন। মহারাষ্ট্র বিজ্ঞানযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে, এই ধরনের যাত্রাতে এমন এক পরিবেশ গড়ে ওঠে—যাতে মানুষ নির্দ্বিধায় অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

বর্তমান বছরের জুন মাসে বোম্বাই শহরে প্রথম বিজ্ঞানযাত্রা আয়োজিত হয়। এই যাত্রার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ'। এদেশে এখন যে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এবং এর গতিপ্রকৃতি যেরকম, তাতে এটাকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বলে লোকবিজ্ঞান সংগঠন মনে করে না। এর বদলে দরকার স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভংগী। তার জন্য প্রথমেই আমাদের নিজেদের শরীর, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। এই প্রসংগে বলা যায়, বোম্বাইয়ের বিজ্ঞানযাত্রা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পেরেছে এক মৌলিক বাণী—"সুস্বাস্থ্য আমাদের এক অধিকার"। এছাড়া এই যাত্রায় সাধারণ অনেক অসুখবিসুখ ও তাদের প্রতিরোধ, নারীদের স্বাস্থ্যসমস্যা এবং সে সম্পর্কে নানা প্রচলিত ভ্রান্তধারণা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশহেতু শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক ঝুঁকি ও বিপদ, ভেষজ ওষুধের অপব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।

বোম্বাইযাত্রার কার্যক্রমগুলি প্রস্তুত করেন লোকবিজ্ঞান সংগঠনের কর্মীরা এবং আঠোরোটি নির্বাচিত পল্লীর প্রত্যেকটিতে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান করা হয়। কোলাবা এবং গোরেগাঁও সংগঠনের তিনটি দল (দলপ্রতি দশজন) রিলে পদ্ধতিতে এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে কাজ করে। প্রতিদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা আটটায় এবং চলে প্রায় তিনঘণ্টার মত।

এ ধরণের যাত্রার জন্যে অনেক আগাম প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমরা প্রচেষ্টা শুরু করেছিলাম মাস দুয়েক আগে থেকে। প্রথমে প্রতিটি নির্বাচিত পল্লীতে একটি ক'রে যাত্রাকমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি স্থানীয় সংগঠনের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার পুরোপুরি গ্রহণ করে। যাত্রা কমিটির চরিত্র একটু প্রশস্ত ধরণের হওয়া প্রয়োজন। তাই প্রতি অঞ্চলের কয়েকজন চিকিৎসক, শিক্ষক, সমাজসেবী, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাদারী লোকের সংগে এবং নারীকল্যাণ, সমাজসেবা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিবিধ সংগঠন এবং স্কুলকলেজ ও হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। লোকবিজ্ঞান সংগঠনের কার্যক্রমের বাইরেও কিছু স্থানীয় অনুষ্ঠান প্রস্তুতির দায়িত্ব যাত্রা কমিটিগুলিকে দেওয়া হয়।

আগাম প্রস্তুতির অন্যদিক ছিল প্রচার। বিভিন্ন সংস্থায় যাত্রাসংক্রান্ত বক্তৃতা দিয়ে, সংবাদপত্রে লিখে, বহুসংখ্যক দেয়ালচিত্র লাগিয়ে ও নিশান উড়িয়ে এবং হ্যান্ডবিল বিতরণ ক'রে প্রচারকার্য চলে। যাত্রা তহবিলের বেশীর ভাগ অর্থ বিভিন্ন শিক্ষাসংস্থা, গবেষণাকেন্দ্র এবং অন্যান্য সংগঠনের কর্মীদের ব্যক্তিগত চাঁদার মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়। প্রস্তুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ ছিল উপযুক্ত কার্যসূচী তৈরী। যাত্রার বিষয়গুলি নিয়ে লিখিত নাটক ও গানগুলি প্রয়োজনমত অদলবদল ক'রে এবং শিল্পী নির্বাচন ক'রে মহড়া দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি পুস্তিকা লেখা হয়। বিষয়-বস্তু ছিল—রক্তাল্পতা, টনিক, বিসিনোসিস (তুলাকণা থেকে উদ্ভূত এক রোগ, সুতাকলের কর্মীরা যাতে খুব বেশী ভোগেন) ইত্যাদি। এছাড়া ছিল

লোকবিজ্ঞান সংগঠনের অন্যান্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পুস্তিকাও। "শিশুমঙ্গল," "বহুজাতিক ওষুধকোম্পানি ও ভারতবাসীর স্বাস্থ্য", "সাধারণ সর্দিকাশি ও উদরাময়" প্রভৃতি আমরা আগে থেকেই পূর্ণমুদ্রিত করে রেখেছিলাম।

লোকবিজ্ঞান সংগঠন যে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অয়োজন করেছিল, তার অনুষ্ঠানসূচী ছিল নিম্নলিখিত রকম। প্রথমদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের নিজস্ব গানগুলি গাওয়া হয়। এরপরে মানুষের পরিবেশ ও সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা এবং মানুষের নানান সমস্যার সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভূমিকার পর লোকবিজ্ঞান সংগঠনের লক্ষ্য কি বুঝিয়ে বলা হয়। আমাদের লক্ষ্য সমাজের সর্বস্তরে এবং মানুষের সর্ববিধ প্রয়াসে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসার ঘটানো। এবং যাত্রার উদ্দেশ্য হল সংগঠনের বার্তা সমাজের সর্বস্তরে বিশেষত অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে পৌছে দেওয়া এবং বিভিন্ন বৃত্তিক্ষেত্র থেকে বহুসংখ্যক লোককে সক্রিয় কর্মী হিসেবে আকর্ষণ করা।

প্রধান অনুষ্ঠানের প্রথম দফায় রক্তাল্পতা ও নারীস্বাস্থ্যের উপর একটি মারাঠী নাটক পরিবেশিত হয়। নাটকটিতে সাবেকী মারাঠী লোকনাট্যের রীতিতে সংলাপ, গান ও নানা রসিকতার মধ্য দিয়ে নারীস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে পুরুষসমাজের অজ্ঞতা এবং ঘরেবাইরে নারীদের কাজকর্মের গুরুত্বের উপরে আলোকপাত করা হয়। এ ছাড়া রক্তাল্পতার উপরে প্রদর্শিত এক স্লাইডশো'তে নারীদের খাদ্য চাহিদার সংগে তাঁদের শরীরের অধিকতর লৌহকণিকার প্রয়োজনের সম্পর্কটি বোঝান হয়। এর পর কুষ্ঠরোগের উপরে একটি স্লাইডশো দেখান হয়। এতে এই রোগের চিকিৎসা-সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়া সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলিও ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রথম দিনের শেষ অনুষ্ঠান হয় "বিজ্ঞান গপ্পো"। এতে প্রধান অংশ নেন স্থানীয় কয়েকটি হাসপাতাল থেকে আগত কয়েকজন সমাজ সচেতন চিকিৎসক। প্রশ্নকারীরা তাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি কাগজের টুকরোতে লিখে দেন বা স্বেচ্ছাসেবকদের লিখে নিতে বলেন। এই অনুষ্ঠানটি অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক জায়গায় এত প্রশ্ন আসতে থাকে যে, অনুষ্ঠান গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে। বহু মানুষের মনে তাঁদের শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানান প্রশ্ন জমে থাকে, যা সবসময় তাঁরা চিকিৎসকদের সংগে আলোচনা করার সুযোগ পান না। আমরা এরকম অনেক সাধারণ প্রশ্ন ও তাদের উত্তর সংগ্রহ করেছি—এগুলো পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হবে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে নানান ধরনের পরিক্ষা-নিরীক্ষা হাতে-নাতে দেখান হয়। স্টেথোস্কোপ কি ক'রে কাজ করে। রক্তচাপ কি এবং তা কিভাবে মাপা যায়। রক্তপরীক্ষা কি এবং কিভাবে করা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকে কেমন দেখায়। প্রস্রাবে শর্করাভাগ কিভাবে নির্ণীত হয়। এই পরীক্ষাগুলির সংগে বিভিন্ন রোগের সম্পর্ক কি। এইসব পরীক্ষা ও সেই সংক্রান্ত যন্ত্রগুলি হাতেকলমে দেখার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে প্রভূত কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া শিশুদের জন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একটি খেলার ব্যবস্থা করা হয়। এ খেলায় জৈবজগতের বিভিন্ন শাখার (উদ্ভিদ্, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি ও মানুষ) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপরে আলোকপাত করা হয়। শেষ অনুষ্ঠান ছিল এক 2" দূরবীনের মাধ্যমে নভোমন্ডল নিরীক্ষণ। শিশু-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ দীর্ঘ লাইন দিয়ে শনির বলয়, বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ এবং চাঁদের গহ্বরগুলি দেখতে আসে। এই অনুষ্ঠানটিও গভীর রাত পর্যন্ত চ'লে প্রমাণ করে যে, চিরপরিচিত আকাশের দ্রষ্টব্য বস্তু সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় "জনতার আদালত" নামে এক হিন্দি নাটক দিয়ে। এই নাটকে বহুজাতিক ভেষজ ওষুধের কোম্পানি গুলির এক কল্পিত বিচার দেখান হয়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ : (1) অন্য অনেক দেশে নিষিদ্ধ ভেষজ উপাদান এদেশে চালান, (2) অসংগত টনিক ফর্মুলাকে "বৈজ্ঞানিক" বলে বাজারে চালিয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকরণ থেকে মুনাফাবাজি, এবং (3) স্বেচ্ছায় উৎপাদন কমিয়ে অপরিহার্য নানা প্রাণরক্ষক ভেষজ ওষুধের কৃত্রিম ঘাটতি ঘটান। যেসব সরকারী সংস্থা এবং ডাক্তারেরা এ ব্যাপারে জনগণকে সাহায্য না ক'রে ঐ সব কোম্পানিরই দালালি করেন, নাটকটি তাদের ভূমিকার উপরেও আলোকপাত করে। এর পরে যোগাসনের উপরে একটি অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সবশেষে বিভিন্ন শিল্পে ধূলিকণা ও শব্দ থেকে উদ্ভূত কর্মপরিবেশের নানা অস্বাস্থ্যকর বিপদের উপরে পুণে লোকবিজ্ঞান সংগঠন প্রযোজিত এক দেয়ালচিত্রের প্রদর্শনী হয়।

স্থানীয় যাত্রা কমিটিগুলি যে সব কার্যক্রম প্রস্তুত করে, তাদের মধ্যে ছিল স্কুলে স্কুলে রচনা প্রতিযোগিতা, শিশুদের নাটক, মানুষের শরীরের উপর মডেল প্রদর্শনী, পোশাগত বিপদের উপর ফিল্ম ও স্লাইডশো ইত্যাদি। যাত্রার প্রতিদিন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সুলভ মূল্যের সহজ-বোধ্য নানা বই প্রদর্শিত হয়। এতে সবশুদ্ধ সাত হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

যাত্রার পদ্ধতিতে বহুসংখ্যক লোকের কাছে বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো সম্পর্কে কিন্তু কতগুলো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। মোটামুটি আন্দাজ করা যায় যে, প্রায় দশহাজার লোক আমাদের যাত্রার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন। বোম্বাইয়ের জনসংখ্যার এ এক নগন্য ভগ্নাংশ। তাছাড়া সত্যিই কি আমাদের এই যাত্রা দশহাজার লোকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে? এত শীঘ্র এই ধরনের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। লোকবিজ্ঞান সংগঠনের কর্মীরা ভালমতই জানেন যে, যাঁরা পেশাগতভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ব্যবহার

করেন (এদের মধ্যে বিজ্ঞানীদেরও ধরছি)—তাঁরা তাঁদের বাস্তব জীবনের অন্যান্য প্রয়াসে বা ব্যাপারে সবসময় স্বয়ংক্রিয় ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রয়োগ করেন না। যদিও এ ব্যাপারটি এখনো একটি প্রশ্নের পর্যায়েই রয়েছে, তবু আমাদের মনে হয় যে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান কায়েমী স্বার্থবাহী রূপের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সমাজের সুসমঞ্জস উন্নতির জন্যে তার সর্বাংশের মধ্যে চাই প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বোধশক্তির বৃদ্ধি। যাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে, কর্মসূত্রে অথবা ব্যবহারিক ভাবে এ বিষয়ে আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলকে জড়াতে হবে এই উদ্যোগে। শিক্ষক, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, সমাজ সেবক—জীবনের সর্বক্ষেত্রের মানুষকে টেনে আনতে হবে এতে। বোম্বাইযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই ধারণাই স্বচ্ছতর হল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(1) নেহেরু তারামন্ডল—সমস্ত স্থানীয় যাত্রাকমিটির সভ্যদের উপস্থিতিতে বোম্বাই বিজ্ঞানযাত্রা এখানে উদ্বোধিত হয়।

(2) নেহেরু বিজ্ঞানকেন্দ্র—প্রকৃতির উপরে কয়েকটি ফিল্ম দিয়েছেন।

(3) বিশ্ব বন্য প্রাণী সংগঠন—এঁরা প্রকৃতির উপরে ফিল্ম এবং স্লাইডসেট দিয়ে সাহায্য করেছেন।

(4) নেহেরু কেন্দ্র—পুরো যাত্রাকালীন সময়ের জন্য এঁদের 16 মিমি. প্রোজেক্টরটি এঁরা আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এছাড়া, দূরবীনটিও এঁরা আমাদের ধার দিয়েছেন এবং "নভোমন্ডল নিরীক্ষণ" এই কার্যক্রমে সক্রিয়ভাব সাহায্য করেছেন।

এঁদের সকলের কাছে আমাদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। □

অনুবাদঃ প্রবীর রায়

বিশেষ প্রতিবেদন

'টেকনিকাল এডুকেশন' উপলক্ষ্য—আসলে 'লোকের ঈশ্বরে আনন্দ'

গত এগারই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় 'টেকনিকাল এডুকেশন'। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান, বেশ কয়েকজন বড় বড় জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বা ডেপুটি, বেশ কয়েকটি প্রাইভেট সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এছাড়া বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রীরা তো ছিলেনই। আঙ্গিকে ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ছিল না কোন। একের পর এক বক্তা তাদের বক্তব্য রাখছিলেন। চায়ের বিরতি লাঞ্চের বিরতি যথানিয়মে এসেছে। আবার চলেছে বক্তৃতার পালা। একটু ঝিমুনিই বুঝি দেখা দিয়েছিল শ্রোতাদের মধ্যে। এমন সময় শোনা গেল হলের বাইরে মৃদু গুঞ্জন। জনা কয়েক কর্তাব্যক্তি ছুটে গেলেন বাইরে। বোঝা গেল ভি. আই. পি কেউ আসছেন। সবাই সামান্য নড়েচড়ে বসলেন। দরজায় দেখা গেল সৌম্য দর্শন এক সন্ন্যাসী প্রবেশ করছেন। সবার দৃষ্টি ওই দিকে। মঞ্চে বক্তৃতারত ভদ্রলোকের চোখে মুখে অসহায় ভাব। হলের বিভিন্ন সারি থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন দুচারজন পুরুষ মহিলা। বেশ কিছু লোক হুড়োহুড়ি করে প্রবেশ করল হলে। তার মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। হল ঘরটা ভরে গেল। সন্ন্যাসীকে ঘিরে একটি জটলা সৃষ্টি হল। কয়েকজনকে দেখা গেলো উপুড় হয়ে পদধূলি নিয়ে মাথায় বোলাতে বোলাতে জটলা থেকে বেরিয়ে আসছেন। মঞ্চের ভদ্রলোক তার বক্তৃতা শেষ করতেই পরবর্তী বক্তা হিসেবে সন্ন্যাসীর নাম ঘোষণা হল। ধীর শান্ত পদে এগিয়ে এলেন তিনি। বিনম্র ভঙ্গীতে শুরু করলেন ভাষণ। বললেন বিবেকানন্দও টেকনিক্যাল এডুকেশন চেয়েছিলেন। তবে তার ফলে মানুষের প্রতি ভালবাসা, দরদ, ভদ্র আচরণ উঠে যাক তিনি চান নি। উদাহরণস্বরূপ ট্রামে বাসে বয়স্ক লোকেদের ধাক্কা দেওয়ার কথা বললেন। এই আচরণের নিন্দা করলেন। এই ভাবে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি। সশব্দ করতালিতে ফেটে পড়ল হল ঘর। ম্রিয়মান হয়ে এলো আর সব বক্তাদের টেকনিক্যাল বক্তৃতাগুলি। ধীরপদক্ষেপে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন সন্ন্যাসী। কয়েকজন ব্যক্তি এগিয়ে দিতে নিয়ে চললেন তাকে হলের বাইরে। যেমন সাড়া জাগিয়ে এসেছিলেন সন্ন্যাসী তেমনি সকলকে বিষণ্ণ করে চলে গেলেন। ঝটিতি শ্রোতারাও বিদায় নিলেন সন্ন্যাসীর সাথেই। পড়ে রইলেন গুটি কয়েক মানুষ। বাকি বক্তারা কি যেন বললেন আরও কিছুক্ষণ। ঘোষাণমত শিক্ষাসমস্যা নিয়েই বলে থাকবেন হয়তো, কিন্তু অনেকেই তখন অন্যজগতে। মনে হচ্ছিল প্রেমহীন এই সংসারে কি হবে এসব ভেবে?

সবার না হোক কারো কারো নিশ্চই জানতে ইচ্ছা করছে কে এই নায়ক আর কারা ওই পার্শ্বচরিত্রের লোকজন। সন্ন্যাসী হলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনঃ অফ কালচারের সেক্রেটারী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। আর তাকে ঘিরে জটলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে যাদের দেখা গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন—নাঃ নাম করার দরকার নেই। কেমিস্ট্রি, রেডিওফিজিক্স—ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের নামী অধ্যাপক অধ্যাপিকা সব—অতি পরিচিত 'বিজ্ঞানী'। এরপরও কি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলবেন ভক্তি বলে কিছু নেই। ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতে ভুলে গেছেন বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজন? □

বিশেষ প্রতিবেদক

সম্প্রতি জনবিজ্ঞান আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এ রাজ্যেও প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু মৌলিক সমস্যা কিছু রয়ে যাচ্ছে। 'বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন'-এর স্বকীয় গুরুত্ব তাই কমছে না। দুই ধরনের আন্দোলনের ভিতর সম্পর্ক ঠিকমত নিরূপিত হওয়া দরকার।

বিজ্ঞানক্লাব আন্দোলন : একটি পর্যালোচনা

দীপক কুমার দাঁ

সঠিক অর্থে 'বিজ্ঞান ক্লাবের' পত্তন ষাটের দশকে। যদিও স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর একটা রেওয়াজ আগে থেকেই চালু ছিল। ভূতত্ত্ববিদ প্রমথ নাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উৎসাহী আয়োজক ছিলেন, যা সংঘটিত হয়েছিল বিশ ও তিরিশের দশকে। 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনী এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের সূচনা করে। 1959 সালে বিড়লা ইনড্রাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞান ক্লাব স্থাপনা এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজনকে উদ্দীপিত করে। 'অ্যাকাডেমিক' (প্রথানির্ভর) বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল ও আগ্রহ গড়ে তোলা এবং বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রসারে প্রথামুক্ত (non formal) বিজ্ঞান চর্চা বা আড্ডার পরিবেশ গড়ে তোলার একটা প্রয়াস শুরু হয় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলার মাধ্যমে।

বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলার অন্যতম লক্ষ্যগুলি ছিল হাতে-কলমে কাজ করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। মডেল তৈরী করা এবং এসব দিয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী করা। সত্তর দশকের গোড়ায় বি. আই.টি. এম বিজ্ঞান মডেল-প্রজেক্ট প্রতিযোগিতার রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠান শুরু করে। ক্রমে জহর শিশু ভবন এবং রাজ্য সরকার এ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। দিল্লীর এন. সি. ই. আর. টি সর্বভারতীয় স্তরে বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে একদশকের বেশী সময় ধরে। মডেল তৈরীর মাধ্যমে বিজ্ঞান ক্লাবের ছেলে-মেয়েরা বিজ্ঞানের নানা শাখায় একটা ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে। তাদের কৌতূহল বাড়ে। একস্ট্রাক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটি হিসাবে বিজ্ঞান ক্লাবের কাজ একটা বিশেষ সাংস্কৃতিকশিক্ষা নির্ভর কর্মদ্যোগ হিসাবে জনস্বীকৃতি লাভ করত সক্ষম হয়। বিজ্ঞান ক্লাবরা মডেল তৈরী বাদেও আলোচনা চক্র, পদযাত্রা, কুইজ প্রতিযোগিতায় যোগদান, পাঠাগার পরিচালনা, বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ, ভ্রমণ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক শিবির পরিচালনা, আকাশ পর্যবেক্ষণ, ফটোগ্রাফী চর্চা ইত্যাদি কাজকর্ম অনুষ্ঠিত করে এবং এধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞান ক্লাবের চর্চা আরও প্রসারিত হয়। এই সময় বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়। বিভিন্ন কাজকর্মে সহমর্মীতার ক্ষেত্র প্রাসারিত করায় এবং ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ক্লাব গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞান ক্লাবদের বিভিন্ন সমস্যা (ঘরের সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, নেতৃত্বের সমস্যা ইত্যাদি) দূর করার ক্ষেত্রে সমস্ত বিজ্ঞান ক্লাবদের মধ্যে সংঘবদ্ধ যোগসূত্র গড়ে তোলার মানসে, চিন্তা-ভাবনার আদানপ্রদানে একটা সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম (co-ordination) তৈরীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান ক্লাবরা যেমন সাবালক হবে, কাজকর্মে প্রত্যয়নিষ্ঠ হবে তেমনি বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনও সুবিস্তৃত হবে বহুতর শাখা-প্রশাখায়। বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন আসলে যুবশক্তির প্রকাশের একটা প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে সুস্থ সংস্কৃতিনির্ভর একটা সমাজচেতনা ও বিজ্ঞান মানসিকতার পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে।

এরকম মনোভাব থেকেই 1979 সালের 14 ও 15ই আগস্ট, মূলতঃ পঃ বঙ্গের বিজ্ঞান ক্লাবরা (40টি) এক সম্মেলনে মিলিত হয় গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের আহ্বানে। এই সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞান ক্লাবদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমবন্য় গড়ে তোলার জন্য একটা সহযোগী সংস্থা গড়ে উঠুক এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক হয়, বিজ্ঞান ক্লাবদের স্বাধীন অস্তিত্ব এবং সর্বপ্রকার স্বাধীনতা বজায় রেখে এমন একটা কাজের ভিত্তিতে সমন্বয়ী সংগঠন গড়ে তোলা হবে, যার লক্ষ্য বিজ্ঞান ক্লাবদের মধ্যে ঐক্য ও কাজের ইস্যুতে সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলা। দ্বিতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন অনুষ্ঠি হয় কোন্নগর, নবগ্রামে ; পাইয়োনীয়ারস্ গ্রুপের ব্যবস্থাপনায়। এখানে এই ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সংবিধান রচনার একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রথমে সংবিধানের একটি খসড়া (মতামতের জন্য) প্রায় 200 বিজ্ঞান ক্লাবে পাঠায়। এর থেকে যেসব সংশোধনী ও নতুন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আসে, তা ঠিক করে তৃতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনে (বিজ্ঞান পরিষদ, কাটোয়া, বর্ধমানে অনুষ্ঠিত) তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই সংবিধানের ভিত্তিতে প্রথম কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এপ্রিল, 1982তে। চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর, নদীয়ায়—নবগঠিত বিজ্ঞান ক্লাবদের সমন্বয়ী সংগঠন 'পূর্বভারত বিজ্ঞান ক্লাব সমিতি'র (Eastern India Science Club Association) পরিচালনায় এবং নদীয়া জেলা সংযুক্ত বিজ্ঞান সমিতির ব্যবস্থাপনায়।

বর্তমানে এই সমিতির সদস্য বিজ্ঞান ক্লাবের সংখ্যা 70 প্রায়। বিজ্ঞান ক্লাবদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই সমিতি বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন প্রসার

কল্পে নিয়োজিত। বিজ্ঞান ক্লাবদের মুখ্য কাজ কি হবে? এনিয়ে সম্প্রতি কালে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এছাড়া 'বিজ্ঞান আন্দোলন' কথাটার তাৎপর্য এবং কার্যকরী ক্ষেত্রের বিস্তৃতি নিয়েও নতুন ভাবনা চিন্তা চলছে। বিজ্ঞান মানসিকতা কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক এবং এনিয়ে নানা মতদ্বৈত দেখা যায়। বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী বা বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বজ্জনের মধ্যে এ বিষয়ে গুরুতর মতপার্থক্য আছে। কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি সংস্থা। এই সংস্থার সম্পাদক কে কৃষ্ণকুমার বললেন, "সায়েন্টিফিক অ্যাটিচুড কথাটা বর্তমানে অতি ব্যবহারে জীর্ণ। আমাদের বক্তব্য—Science For social Revolution। এ বিষয়ে কে. এস.এস.পি-র একটা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা আছে। পুস্তিকায় যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, তার সারমর্ম হোল 'বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ সংগঠন'। যে কোন সমাজ সংগঠন পরিকল্পনা তার দার্শনিক-রাজনৈতিক ভিত্তির নিরীখে গড়ে তোলা হয়। বিজ্ঞান আন্দোলনকারীদের কাজের এক্তিয়ার কতটা এবং অন্যান্য সমাজ সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলির কাজের পরিসর কি—এবিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার এবং যুক্তিধর্মীতার প্রতি সচেতন মনোভাব সৃষ্টির পক্ষে কাজ করা। একাজ নিঃসন্দেহে একটা সুস্থ সমাজবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু এই প্রয়াসকে সমাজ সংগঠন আন্দোলনের সহযোগী কাজ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান-আন্দোলনকারীদের হাতে সমাজকাঠামোর রূপায়ন ও বিন্যাস রচনার দায়িত্ব নেই বলেই মনে করি।

কে. এস. এস. পি-র কাজের ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতে নানা ধরনের বিজ্ঞান আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'গণবিজ্ঞান আন্দোলন'। পঃ বঙ্গেও এধরণের সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং এই বিষয়ের আলোচনাও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মূল কথাটা হোল—ব্যাপক জনমানসে বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ে তোলা। এজন্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার, যুদ্ধ বিরোধী জনমত গঠন বিজ্ঞান পরিকল্পনা-নীতি ও সরকারী বিজ্ঞান কর্মসূচীর পর্যালোচনা এবং মতামত প্রকাশ করা ইত্যাদি প্রয়াস চলছে। পথসভা, পদযাত্রা, নাটক, স্লাইড শো, পোস্টার চিত্র ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিজ্ঞান চর্চা এবং শক্তিধর দেশের বিজ্ঞান গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক নিয়ে একটা নতুন ধরনের মত ও চিন্তা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে। বিজ্ঞান গবেষণার সুফল এবং কল্যাণ যাতে সমগ্র মানবসমাজ ভোগ করতে পারে, তার জন্য মতামত গড়ে উঠছে। এসব নতুন বিষয়ে বিজ্ঞান আন্দোলন আজ এক সাংস্কৃতিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে। খাদ্যসমস্যা, জন-সংখ্যা, বন্যা-খরা চিকিৎসা, পুষ্টি, গৃহ-বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণের অভাব ও সমস্যা নিয়েও বিজ্ঞান আন্দলনের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই, বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী ভাবে এসব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এ কাজে কিছু সমস্যাও আছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আদর্শবাদী আন্দোলনের সক্রিয় রূপদানে অনেক অসুবিধা আছে। এখনও পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজ করছেন, আজকের বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মী-ডাক্তার-ইনজিনীয়ার-অধ্যাপক-শিক্ষক সবাই মাইনে বাড়াবার আন্দোলনে সামিল। কাজ কমাও, মাইনে বাড়াও—এই যখন সামাজিক পরিস্থিতি, তখন সর্বতোভাবেই বাধার পরিমাণ বিষয়ে অনুমান করা কঠিন নয়।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান আন্দেলনের স্লোগান মিশে যাওয়ায় কিছু বিভ্রান্তি গড়ে উঠেছে। 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'—এই মিছিলে দেখা গেল অমেরিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ যতটা সোচ্চার, অন্য শিবির নিয়ে তেমন কোন বক্তব্য নেই। এর ফলে সাধারণ মানুষ এসব ক্রিয়াকর্মকে ছদ্মবেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত করছে।

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মীরাও যেহেতু মুখ্যত স্কুল-কলেজের ছাত্র, এজন্য তারাও বিভ্রান্ত। বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানভিত্তিক স্বেচ্ছা মূলক কাজকর্ম করার জন্য। অনেকে বলছেন, মডেল তৈরি এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনী—এটা প্রয়োজনীয় কাজ নয়। এর বদলে নানাধরনের 'অ্যকশন প্রোগ্রাম' গড়ে তুলতে হবে। যেমন, কারখানার সামনে পরিবেশ দূষণ বন্ধের আন্দোলন ; আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। মুশকিল হোল, সমাজে বহুমুখী কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগঠন থাকলেও, কাজের ক্ষেত্রে অনেক আবেগনির্ভর কথাবার্তা প্রায়ই দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Indian Chemical Society বা অনুরূপ সংস্থাগুলি পরিবেশ দূষণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ভাবে কর্মকান্ড সংগঠিত করতে পারে। অন্য সংস্থারা তার পাশে প্রয়োজনে সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে অন্য রকম। যেমন, drug control এবং pesticide control ব্যাপারে যেসব ফার্মাসিউটিক্যাল ও সর্বভারতীয় মেডিক্যাল সংগঠন আছে, তারাই এব্যাপারে কেন্দ্রীয়ভাবে সমস্ত বিষয়টাকে আন্দোলনের পর্যায়ে তুলে ধরতে পারে। তারা চাইলে, অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনরা তাদের পাশে সহযোগী হিসেবে দাঁড়াতে পারে।

আমার মনে হয়, ভারতে যেসব বিজ্ঞান আন্দোলনের সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে, তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সমন্বয়, এবং কাজের ক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে একটা সম্মেলন হতে পারে। তাতে একই কাজের ডুপ্লিকেশন বন্ধ হতে পারে। বিজ্ঞান ক্লাবরা এমন একটি জায়গায় আছে, যেখানে শিশু-কিশোর মনের বিজ্ঞানমুখী বিকাশের সুজন নির্ভর একটা প্রচেষ্টা অনুসৃত হয়। বৃহত্তর বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান প্রথম সারিতে নয়। এ বিষয়ে তাদের পরিণত ধারণাও নেই। বিজ্ঞান ক্লাবের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করতে হলে, বিজ্ঞান-ভিত্তিমূলক কাজের গুরুত্বকে স্বীকার করতে হবে। এজন্য 'বিজ্ঞান-ক্লাব আন্দেলন' এবং 'গণবিজ্ঞান আন্দোলনের' মধ্যে স্পষ্টতঃ একটা দূরত্ব থাকাই বাঞ্ছনীয়। □

এই ৩৪তম

সাধারণতন্ত্র দিবসে

আসুন আমরা নতুন করে শপথ গ্রহণ করি—

- আমাদের সাফল্যগুলিকে স্থিতিশীল করে তুলি
- দেশ গঠনের কাজে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করি
- সর্ব্বপ্রকার সম্পদ সংগ্রহে প্রচেষ্ট হই
- অপ্রয়োজনীয় খরচ পরিহার করি এবং মিতব্যয়িতা পালন করে চলি

ভবিষ্যতের সকল কাজে প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাই

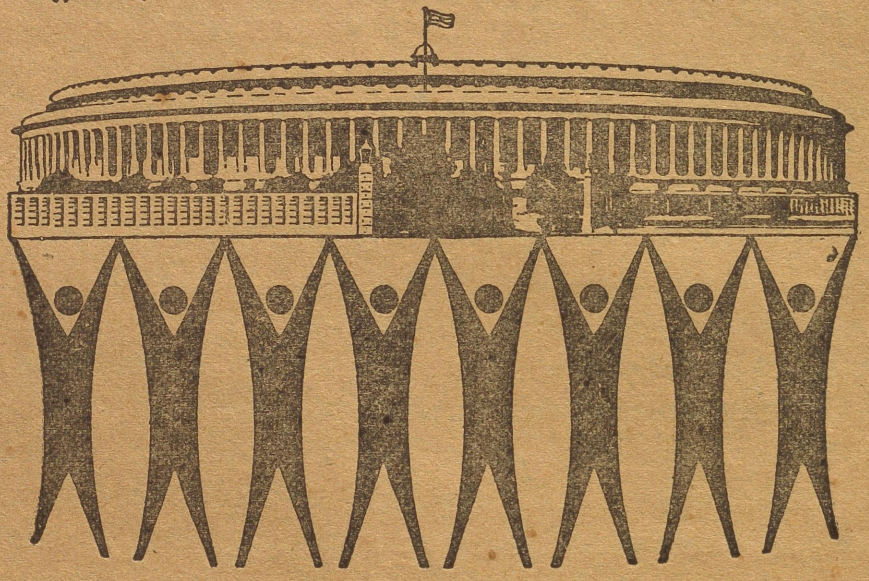

যে সমস্ত শক্তি আমাদের দুর্ব্বল করে তোলবার প্রচেষ্টায় রত তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

আজ এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তৈরী থাকুন

davp 83/432

পরিক্রমা

পাড়ায় পাড়ায় অক্সিজেন পাম্পিং স্টেশন

গত ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখের সংবাদপত্র কলকাতাবাসীদের একটি সুসংবাদ পরিবেশন করেছেন। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড এবং মধ্য কলকাতা রোটারী ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে একটি 'অক্সিজেন সেন্টারের' উদ্বোধন হয়েছে। অসুস্থ রোগীদের জন্য ন্যায্যমূল্যে অক্সিজেন সিলিণ্ডার মিলবে এই সেণ্টার থেকে। বলাই বাহুল্য, এধরনের সেণ্টারের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে একটি কেন, এমন একশটি সেণ্টারও কলকাতার মত শহরের পক্ষে অপ্রতুল। আশা করছি অচিরেই সরকারী সহযোগিতায় এমন আরও অনেক সেণ্টার স্থাপিত হবে।

তবে শুধুমাত্র শিল্পপতিদের সদিচ্ছার (!) উপর নির্ভর করে থাকলে সে আশা দূর অস্ত। যদিও এই সেণ্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 'সম্প্রতি কিছু কিছু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের··· সমাজ সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন ভারতের মত মিশ্র অর্থনীতির দেশে শিল্পপতিদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে'। হ্যাঁ, শুনেছি তারা নাকি কিছু কিছু সেবামূলক কাজকর্ম করে থাকেন। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। দয়ালু হিসেবে ইমেজ গড়া। আর 'পরলোকের' জন্য একটা হিল্লে করে রাখা। তা সে যে উদ্দেশ্যেই হোক কাজটা ভালো। মুনাফার কিয়দংশ (কালো টাকা নয় তো?) জনসেবায় ব্যয়িত হলে গরীব দু'একজনের ইহলোকের সংকট উত্তরোয়— সেটা কম কি।—যথা লাভ।

অক্সিজেন সেণ্টার প্রসঙ্গে আগামী দিনের জন্য জরুরী একটি প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দিই। দয়ালু ব্যবসায়ীদের জন্যই এই 'স্কুপ'।—যত শিগ্‌গির পারেন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় দু'এক ফালি জায়গা দখল করুন। পেট্রোল পাম্পের মত 'অক্সিজেন পাম্পিং ষ্টেশন' খুলে বসুন। বেশী দেরী নেই, ভয়ংকর বায়ু দূষণের ফলে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মানুষ শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে আকুপাকু করবেন। তখন একটুখানি বিশুদ্ধ অক্সিজেন 'ইনহেল' করে ফুসফুসটাকে হালকা করে নিতে লম্বা লাইন পড়বে আপনার পাম্পিং ষ্টেশনের বাইরে। মিনিটে পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা যা ইচ্ছে রেট করুন। প্রাণের দায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে মানুষ। তবে দেখবেন স্বভাসিদ্ধ কায়দায় অতি মুনাফার লোভে রাস্তার মোড়ে মোড়ে লুকিয়ে ব্লোয়ার দিয়ে ধুলো ওড়াবার ব্যবস্থা করবেন না। তাহলে ইনহেলার নিজের নাকে লাগিয়েই বসে থাকতে হবে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

যুদ্ধ করতে আর অস্ত্র লাগবে না

ঘোড়দৌড় অস্ত্রদৌড় সাইকেলদৌড় শুনেছেন। মনোদৌড় (Mind Race) শুনেছেন কি? নৌযুদ্ধ ট্যাংকযুদ্ধ মুষ্ঠিযুদ্ধ শুনেছেন। মনোযুদ্ধের (Mind War) কথা শুনেছেন কি? সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নামে দুখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। বই দুটি কিছু স্কুপ ছেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মাথায় হাত। সোভিয়েত যুক্তরাজ্য নাকি প্যারা (ভুয়া?)-সাইকোলজির গবেষণায় অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তারা যুদ্ধের কাজে লাগাচ্ছেন এই বিদ্যা। তাদের কাছে খবর আছে, সোভিয়েতের চোখে ধুলো দিয়ে মিসাইল লুকিয়ে রাখতে হাজার কয়েক কোটি ডলার ব্যয়ে যে এম-এক্স প্রজেক্ট তারা চালু করতে চলেছে, মস্কোতে বসেই একজন প্যারাবিশেষজ্ঞ নাকি মনসংযোগ করে তার নির্ভুল হদিস বাতলে দিতে পারবে। কি সর্বনাশ!

আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। সিয়া, ন্যাটো, মার্কিন নৌবাহিনী যৌথভাবে কাজে নেমে পড়েছে। যে করেই হোক প্যারা-বিজ্ঞানে সোভিয়েতের সমকক্ষ হতে হবে। তারা পরীক্ষা করে দেখছেন মানুষের মন বড় দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করতে পারে কিনা। খুঁজে বেড়াচ্ছেন তেমন সাইকিকদের যারা অন্যের মন পড়তে পারেন। তাদের দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে সোভিয়েত সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। দেখছেন দূর থেকে কম্পিউটারকে অকেজো করে দেওয়া যায় কিনা। অন্যদেশে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা যায় কিনা। গোপন ফাইলের পাঠোদ্ধার করা যায় কিনা। মাঝপথে মিসাইল ধ্বংস করা যায় কিনা। ইত্যাদি আরো হরেক যুদ্ধের মনোপ্রয়োগ খতিয়ে দেখছেন।

তবে এ লাইনে উন্নতি হলে মন্দ নয়। অহেতুক কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে নিত্যনতুন অস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন হবে না। তার বদলে জনকয়েক প্যারা-বিশেষজ্ঞ দিয়ে (মহেশ যোগীদের আরো সুদিন আসছে) বিপক্ষ দেশের তাবৎ যন্ত্রবিদ, অস্ত্রবিদ, যুদ্ধবিদ্‌দের খতম করে দিলেই হল। পৃথিবীতে চিরতরে শান্তি স্থাপিত হবে। তবে রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের ভুল করে খতম করে দেবার দুর্মতি যেন কারো না হয়। কারণ নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। এরা বেঁচে থাকলে অন্তত মুখে মুখে এ ওর পেছনে লেগে পৃথিবীর মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারবে।

এইসব ই. এস. পি., টেলিপ্যাথি সাইকোকাইনেসিস আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু দেশের প্রতিরক্ষার (পরদেশ আক্রমণ?)

ভার যাদের উপর ন্যস্ত তারা তুচ্ছ সম্ভাবনাকেও উপেক্ষা করতে পারেনা। সেজন্য সামান্য 'ক্ষু'র জন্য মোতায়েন রেখেছেন বিরাট গুপ্তচর বাহিনী। আমাদের ভয় বাংলার রূপকথায় বর্ণিত 'নিমেষে সব করতে পারে' সেই ভূতটার কথা না ওরা জেনে যায়। তাই নিয়েই লেগে যাবে গবেষণায়। ফলে আমাদের ঘরের শিশুদের এমন সাধের গল্পের রসটাই যাবে ভেস্তে।

মাতৃগর্ভজাত সন্তান না জিনব্যাঙ্কজাত সন্তান কে হবে উত্তরাধিকারী

পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক জেনেটিকস কংগ্রেস এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল ভারতে। গত ডিসেম্বর মাসে। বিশ্বের নানান দেশ থেকে প্রায় আড়াই হাজার অতিথি ও বিজ্ঞানী যোগ দিয়েছিলেন এতে। বক্তৃতা দিয়েছেন অনেকে। বহু আশার বাণী শুনিয়েছেন আগামী দিনের জন্য। বলেছেন কৃষির ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবে জেনেটিক বিজ্ঞান। ওষুধ নির্মাণ ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বনসৃজনের ক্ষেত্রেও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ইত্যাদি। তবে ভয়ও দেখিয়েছেন অনেকে। বলেছেন জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারিংয়ের সাহায্যে মারাত্মক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টি করা হতে পারে।—যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য।

অতিথি বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভারতের এককালের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ডঃ এম. এস. স্বামীনাথনও ছিল। তিনি একটি বিশেষ সম্ভাবনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পুরুষ ও মেয়েদের 'শুক্রানু ও ডিম্বানু ব্যাঙ্কের' আইডিয়া তাঁর খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে পরমাণু যুদ্ধে সব ধ্বংসের সম্ভাবনার কথা মনে রেখে। অবশ্যি তারপর এই শুক্রানু ডিম্বাণু মেলানোর জন্য কে টিঁকে থাকবে সে কথা বলেননি।

এই প্রসঙ্গে স্বামীনাথন ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মত এক নয়। স্বামীনাথন চান এই 'জিন ব্যাঙ্কে' বিশ্বের প্রতিভাধর পুরুষ ও মহিলারাই কেবল আমানতকারী হোন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর তা পছন্দ নয়। তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানীকুলের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন—'কে এর বিচারক হবেন'?

আসলে গণ্ডগোল অন্যত্র। মনে হয় ভবিষ্যতে প্রতিভাধর ভাই-বোনেদের মধ্যে অপ্রীতিকর বিবাদের সম্ভাবনার জন্যই তিনি এটা পছন্দ করছেন না। গর্ভজাত সন্তান আর জিনব্যাঙ্কে গচ্ছিত ডিম্বানুজাত সন্তানের মধ্যে কে হবে বাপ-মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী?

গ্রাইপ ওয়াটারে শিশুর কান্না থামলেও বিপদ বাড়ে

বাচ্চাদের পেট ব্যাথা বা কান্না থামানোর মোক্ষম দাওয়াই (!) হিসেবেই গ্রাইপ ওয়াটারের পরিচিতি। অধিকাংশ মা-ই শিশুদের কান্নার মূল কারণ খুঁজতে যান না। অথচ শিশু নানা কারণে কাঁদতে পারে। ...পেটের ব্যাথা এবং তার কারণ সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও সব বৈজ্ঞানিকরা একমত যে, এই ব্যাথা মোটেই ক্ষতিকর নয় এবং এটি আত্মনিয়ন্ত্রী selfl-imiting। তাই এই ধরণের ব্যাথা প্রশমনের জন্য গ্রাইপ ওয়াটার বা অন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। অভিজ্ঞ শিশু বিশেষজ্ঞরা গ্রাইপ ওয়াটারকে ওষুধ বলে গণ্য করেন না।...

গ্রাইপ ওয়াটারের মূল উপাদান সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট যা সাধারণত আলসারের রোগীরা খেয়ে থাকে এবং এটা কাপড় ধোয়ার কাজেও লাগে। এটার দীর্ঘ ব্যবহারে মিল্ক এ্যালকালি সিনড্রোম হতে পারে এবং রক্তের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বৃক্কে (কিডনী) রক্ত স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বা গ্রাইপ ওয়াটার খাওয়ার পর ঢেঁকুর উঠতে পারে, এমন কি কখনও কখনও পেট ফেঁপেও যেতে পারে। সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের বিষক্রিয়া ও অধিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে এমন কি আলসারের ওষুধেও আজকাল বেশী সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ব্যবহার করা হয় না। শিশুর জন্য মায়ের দুর্বলতা এবং ডাক্তার ও ক্রেতাদের অজ্ঞতার কারণে গ্রাইপ ওয়াটার প্রস্তুতকারকরা একটা অপ্রয়োজনীয় ও অকেজো এবং ক্ষতিকারক ওষুধের চুটিয়ে ব্যবসা করছে।

গ্রাইপ ওয়াটার প্রসংগে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা হলো বোতলের গায়ে লেখা না থাকলেও পাঁচটি অপরিচিত কোম্পানী ছাড়া আর সব কোম্পানীর গ্রাইপ ওয়াটারেই শতকরা 4-10 ভাগ মদ রয়েছে এবং এই মদের কারণেই শিশুরা গ্রাইপ ওয়াটার খাবার পর ঘুমিয়ে পড়ে। আর মা বলেন "বেঁচে থাক আমার বাচ্চার গ্রাইপ ওয়াটার।" ডাক্তারদের অজ্ঞতা মা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। ফলে হুহু করে বৃদ্ধি পেয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক নামধারী মাফিয়াদের ব্যবসা।....

মনে রাখবেন গ্রাইপ ওয়াটার আপনার স্বস্তির কারণ হলেও শিশুর জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর।

[সূত্র ঃ মাসিক গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) আষাঢ় (বাং) 1389]

নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র নির্মানে নিষেধাজ্ঞা

1983-র এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীমকোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে যে যতক্ষণ না তেজস্ক্রিয় আবর্জনার (waste) হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পন্থা সন্দেহাতীতভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ নিউক্লীয় শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ অংগরাজ্যগুলি বন্ধ করতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় এরকম নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাপারটি সুপ্রীমকোর্টে আসে। কিন্তু রীগান সরকারের বিরক্তি উৎপাদন করে বিচারকরা এইসংগে ক্যালিফোর্নিয়ায় বলবৎ স্থগিতাদেশ বহালই শুধু রাখেন নি, অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা ঢালাও স্থগিতাদেশ অনুমোদন করেছেন। নিম্নবিচারালয়ের যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে সুপ্রীম কোর্টও বলেছেন যে তেজস্ক্রিয় আবর্জনার সমস্যার দরুন পরমাণু শক্তি ব্যয়সাধ্য এবং অনিশ্চিত শক্তিউৎস। তবে সুপ্রীম কোর্ট রাজ্যগুলিকে এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণের ভিত্তিতে; নিরাপত্তার প্রশ্নটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরই বিবেচ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। □

সেঁকো বিষের কবলে পশ্চিমবঙ্গ

গত কয়েকমাস ধরে সংবাদপত্রের খবরটা অনেককেই সচকিত করেছে। প্রথমে জানা গেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুরের কাছের একটি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকের প্রভাবজনিত রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ এবং শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালের বিজ্ঞানী ও ডাক্তাররা ক্রমে ক্রমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারেন যে ঐ গ্রামের টিউবওয়েলের পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে। কিছুদিন পরে একই ধরনের রোগের সূত্র ধরে উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরের কাছে আর একটি গ্রামেও অনুরূপভাবে টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গেল। তারপর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল নদীয়া জেলার নবদ্বীপের নিকটবর্তী চর মাজদিয়াতেও। এছাড়া, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় এবং বর্ধমানের একটি এলাকাতেও আর্সেনিকের বিষাক্ত প্রভাবের কথা শোনা যাচ্ছে। একটি পুকুরের জলেও নাকি আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। বস্তুত, বিষক্রিয়ার ব্যাপকতা এবং ভৌগলিক বিস্তৃতি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গেরই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদসূত্রে আরও প্রকাশ যে, সেঁকো বিষের প্রভাবে ঐ সব অঞ্চলের অনেক অধিবাসীরই গায়ের চামড়া কালো হয়ে যাচ্ছে, সারা গা ছোট ছোট কালো দাগে ছেয়ে যাচ্ছে। সেগুলিতে যন্ত্রণা ও পুঁজ হ'চ্ছে। হাত-পা ফুলে যাচ্ছে। লিভার স্ফীত হচ্ছে।

দেরীতে হ'লেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম শুরু করেছেন। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও নিয়োজিত হয়েছে আর্সেনিকের উৎসের সূত্র সন্ধানে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। খুব সম্প্রতি এই কমিটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন বলেও সংবাদে প্রকাশ। কলকাতা হাই-কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ লিগাল এইড সার্ভিস নামে একটি আইনজীবি-সংগঠন হঠাৎ একটি মামলাও শুরু করেছেন কিছুদিন আগে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে।

ইতিমধ্যে আর্সেনিকের উৎস হিসেবে দুটি সম্ভাবনার কথাও উঠেছিল ঃ ইদানীং ব্যবহৃত নানা কীট ও আগাছানাশক ওষুধপত্র মারফৎ আর্সেনিক পরিবেশে ও জলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অথবা টিউবয়েলে জল ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে (শাক-সব্জী, দানাশস্য, মাংস-

ব্যবহৃত পাইপ ও ফিলটারে আর্সেনিক যুক্ত সংকর ধাতু ব্যবহার করার ফলেও কোন কোন কলের জল বিষাক্ত হয়ে পড়তে পারে। সরকারী তদন্ত কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টে প্রকাশ যে বারুইপুরের কাছের গ্রামটিতে পলিথিন পাইপের টিউবওয়েল থেকেও আর্সেনিক-যুক্ত জল পাওয়া গেছে এবং স্বভাবতই, কমিটি দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে প্রায় বাতিলই করে দিয়েছেন। ঐ গ্রামে 110 থেকে 150 ফুট গভীরতার টিউবওয়েল গুলি থেকে আর্সেনিক-যুক্ত জল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এর ফলে কীটনাশকই যে উৎস একথাও কমিটি বলেন নি। বস্তুত, প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী মনে হয় কমিটি এখনও আর্সেনিকের উৎস নির্দিষ্ট করতে পারেন নি। অন্তত, একটি জায়গায় সমীক্ষা চালিয়ে নাকি দেখা গেছে যে নলকূপের গভীরতা একশো ফুটের কম বা পাঁচ/ছশো ফুট বা তার বেশী হ'লে তাতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে না। এটা যদি সত্যি হয় তবে কীটনাশককে উৎস হিসেবে দায়ী করা শক্ত—কেননা সেক্ষেত্রে উপরের স্তরের জলে বরং আরও বেশী মাত্রায় আর্সেনিক থাকারই সম্ভাবনা। তাছাড়া, পুকুরের জলে আর্সেনিকের উপস্থিতিই বা সেক্ষেত্রে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? পশ্চিমবঙ্গের বাজারে চালু কীট বা আগাছানাশক পদার্থগুলির মধ্যে ঠিক কোন কোনটি আর্সেনিকযুক্ত এবং কতখানি আর্সেনিক কিভাবে আছে না জানা পর্যন্ত জোর দিয়ে কখনই বলা যায়না যে কীট-নাশকই আর্সেনিক ছড়াচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আর্সেনিকযুক্ত আগাছা বা কীটনাশকের ব্যবহার অত্যন্ত কমে এসেছে। এদেশেও বেশী হবার কথা নয়। তবুও খতিয়ে দেখা দরকার। কেননা এ দেশের বাজারে বহুল-প্রচলিত কীটনাশক জাতীয় ওষুধের প্যাকেটে উপাদান-সম্পর্কিত তথ্য নিতান্তই অপ্রতুল। স্থানীয় প্রাকৃতিক আর্সেনিকও ক্ষেত্রবিশেষে জলে মিশে গিয়ে থাকতে পারে, যদিও সে সম্ভাবনা ক্ষীণ।

সংবাদপত্রে এযাবৎ যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে অনুমান হয়, মনুষ্যদেহে আর্সেনিক-বিষ-জনিত কুপ্রভাবের সম্ভবত এটিই হবে পৃথিবীর বৃহত্তম ঘটনা। ইতিপূর্বে 1900 খ্রীঃ নাগাদ ইংলন্ডে আর্সেনিক যুক্ত চিনির মাধ্যমে পানীয় বিয়ার বিষাক্ত হয়ে পড়ায় কয়েক হাজার মানুষে বিষক্রিয়া ঘটিয়েছিল, 71 জন প্রাণও হারিয়েছিলেন। আমেরিকা মালয়েশিয়া ইত্যাদি কয়েকটি দেশে আর্সেনিকযুক্ত কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণ হারাণোর খবরও জানা আছে। বাচ্চাদের খাবার গুঁড়ো দুধে এবং কুয়ো থেকে সংগৃহীত পানীয় জলে আর্সেনিক মিশে যাওয়ার জন্য জাপানে 1955-60 সালে দুটি এলাকায় বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

আর্সেনিক তথা সেঁকো বিষ মানুষের দেহে কিডনী, লিভার, প্লীহা, চামড়া, চুল, এবং নখে জমা হয়। এখানে, রোগীরা ঠিক কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তা বিশদভাবে জানা যায়নি, জানা যায়নি

ডিম) বা পানীয় (দুধ) মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক আছে কিনা। তাছাড়া, এমনকি যেসব পানীয় জলে সর্বোচ্চ সীমার (0·05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে) দশ থেকে চল্লিশগুণ বেশী আর্সেনিক পাওয়া গেছে বলে বলা হচ্ছে, সেখানেও অর্সেনিক ঠিক কি অবস্থায় কি ধরনের যৌগ হিসাবে আছে তারও হদিস পাওয়া যায়নি। অথচ, বিষক্রিয়ার মাত্রা ও রকম অনেকটাই এর উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গকে আর্সেনিক-আতঙ্ক থেকে মুক্তির উপায় দিতে এর উৎস নির্দিষ্ট করতেই হবে আর তার জন্য উপরিউক্ত সমস্ত তথ্যই জানা একান্ত জরুরি।

অন্তর্বর্তীকালীন পন্থা হিসেবে কোন রাসায়নিক বা ভৌত উপায় পানীয় বা অন্যান্য ব্যবহার্য জলের আর্সেনিকের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায় কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। জনস্বার্থেই বিশেষজ্ঞ কমিটির সমস্ত রিপোর্ট সাধারণে প্রকাশ করতে সরকারের বিলম্ব করা উচিত নয়। □

রবীন মজুমদার

বইপত্র পরিচিতি

প্রগতিবার্তা □ বিশেষ জনবিজ্ঞান সংখ্যা □ প্রাপ্তি স্থান B6/119 কল্যানী, 714235 ; মূল্য দু'টাকা।

প্রগতিবার্তার বিশেষ 'জনবিজ্ঞান' সংখ্যা বেরিয়েছে গত অক্টোবর মাসে। গত কয়েকবছর শুরু হয়েছে গণবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকর্ম। দেশের নানান প্রান্তে এবং পশ্চিমবঙ্গেও। কাজের বিভিন্ন পর্বে বহু প্রশ্ন উঠেছে, আলোচনা হচ্ছে। তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি এই বিশেষ সংখ্যা। ক্রমে বেশী বেশী মানুষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার ঘোষিত লক্ষ্য এবং ফলাফল সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে উঠছেন। সংশয়ী 'প্রগতিবার্তা'ও।

'কেন এই বিশেষ জনবিজ্ঞান সংখ্যা' শীর্ষক সম্পাদকীয় কলমে "আধুনিক বিজ্ঞানকে আরো ভালভাবে বোঝা এবং শ্রমজীবী ব্যাপক জনসাধারনের দৃষ্টিতে তার উপযুক্ত মূল্যায়নের" প্রয়োজন বলা হয়েছে। এবং তাকে "সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করার" কথা বলা হয়েছে। গোটা সংখ্যার বিষয়গুলি তিনটি ভাগে ভাগ করে দেখা যায়।

এক, কয়েকটি রাজ্যের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অভিজ্ঞতার বিবরণ। মূলত কেরল, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত নেওয়া হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ কিভাবে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত, তাদের কাজের ক্ষেত্র এবং ধরন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা মেলে লেখাগুলি থেকে। এই কাজগুলি যে হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি, জনজীবনের চলতি প্রবাহের সাথেই মিলেমিশে ছিল এ ধারণা স্পষ্ট হয় মহারাষ্ট্রের 'সত্য শোধক সংস্কৃতিক মঞ্চের ভূমিকা' থেকে। কেরলে অনুষ্ঠিত 'সারা ভারত গণবিজ্ঞান আন্দোলন সম্মেলনে'র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে কিভাবে গণবিজ্ঞানের কাজকে সংগঠিত করা যায়। এবং কাজ শুরুর পথের দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং ভাবনার আভাস মেলে পশ্চিবঙ্গের অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে।

দুই, প্রথাগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার জনবিরোধী চরিত্রের দিকগুলি নিয়ে আলোচনা। আমাদের দেশের এবং উন্নত দেশের দৃষ্টান্ত সহকারে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে 'জনবিজ্ঞান ও ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে।

তিন, মারনাস্ত্র নির্মাণকারী একটি সংস্থার শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের অভিনব এক সংগ্রামের বিবরণ। আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান। 1981 সালের বিকল্প নোবেল পুরুস্কার বিজয়ী বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার মাইক কুলীর নোবেল বক্তৃতাটি এক কথায় অনবদ্য। এর মধ্যে আছে কিভাবে বহুজাতিক কর্পোরেশনের একটি কারখানার শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদরা দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে এর পরিচালনভার নিজেদের হাতে নেন এবং তাকে মানুষ মারার সরঞ্জাম উৎপাদনের বদলে জ্বালানী সাশ্রয়কারী পাম্প, মোটর ও প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী গাড়ী ইত্যাদির মত মানবিক পণ্য-সামগ্রী নির্মাণকারী সংস্থায় পরিণত করেছেন তার গৌরবজনক অধ্যায়ের বিবরণ। চলতি সমাজে শিক্ষা গবেষণা ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতা ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে এই বক্তৃতায়। গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই উপলব্ধি। পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য। লেখাটির বহুল প্রচার প্রয়োজন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা গোষ্ঠী তাদের পত্রিকায় এটি পুনর্মুদ্রণের কথা ভাবতে পারেন।

র.না.চ.

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিষয় জনস্বাস্থ্য

ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য □ পরিবেশক ঃ দাসগুপ্ত এ্যান্ড সনস্ □ কলেজ স্ট্রীট □ পৃ ৯০ □ দাম দশ টাকা

ডাক্তারদের সাম্প্রতিক আন্দোলন আমাদের অনেককেই 'জনস্বাস্থ্য' সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। সুখের কথা "বিষয় জনস্বাস্থ্য" নামের বইটি এমন একটি সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনটি পর্বে ভাগ করা প্রবন্ধগুলি। যেমন, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং চিকিৎসা-গবেষণা। লেখাগুলি খুবই বলিষ্ঠ এবং যুক্তিতে স্পষ্ট। বহু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন লেখক যা আপাতভাবে তুচ্ছ বা ছোটখাট মনে হলেও তা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার আভাস মেলে লেখা থেকে। প্রতিটি লেখাই অ-ডাক্তার পাঠকদের কিছু শেখাবে, ভাবাবে, স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করার যোগ্য করে তুলবে।

"স্বাস্থ্য" পর্বের দু'একটি প্রবন্ধে বিষয় দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করি। প্রবন্ধের নাম "জনস্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত"। লেখক বলতে চেয়েছেন চিকিৎসক নামক গুটিকয়েক বিশেষ বৃত্তির মানুষ একটি জাতির 'স্বাস্থ্যের' জিম্মাদার হতে পারে না। বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রোগ নিরাময়ের প্রয়াস বোঝায় না। স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত খাদ্য ন্যূন পরিবেশ। আর তা থাকলে জাতির স্বাস্থ্যের ব্যাপারে চিকিৎসকের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় প্রান্তিক পর্যায়ের। প্রধান থাকে না।—অর্থাৎ স্বাস্থ্য লাভের পূর্ব শর্ত হল জাতীয় আয়ের প্রয়োজন ভিত্তিক বণ্টন এবং সকলে জন্য জীবন ধারণের নূনতম সংস্থান।

স্বাস্থ্য পর্বের দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম "স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্প"। লেখকের বক্তব্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনেক ব্যবস্থা নিতে ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত ট্রেনিং থাকলে এই ব্যবস্থা অ-ডাক্তার জনগণ নিজেরাই নিতে পারেন। কিন্তু এই ট্রেনিং কি ভাবে হতে পারে? উত্তরে লেখক স্বাস্থ্য বিষয়টি স্কুল-পাঠ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিয়েছেন। স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা রোজ অনেক সময় ধরে কামস্কাট্কা কোথায় অবস্থিত বা কোন পরমাণুর কেন্দ্রীণে কটি প্রোটন আছে সেইসব তথ্য মুখস্থ করে। অথচ প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িত কত বিষয়ইনা উপেক্ষিত। সেখানে যদি একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক বিপদে প্রাথমিকভাবে কি করণীয় বা নিজের পরিবারের সাধ্যের মধ্যে কোন ধরনের খাবার খাওয়া ভাল, বাড়ীতে কারো অসুখ হলে অন্য সকলের কি সাবধানতা নেওয়া প্রয়োজ, বয়ঃসন্ধির বিস্ময় ও সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে দেওয়া যায় তাহলে আখেরে লাভ অনেক বেশী। লেখকের এই প্রস্তাব আশু কার্যকরী হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পর্বে লেখক সুন্দরভাবে আমাদের দেশের একটি চিকিৎসা-চিত্র উপস্থিত করেছেন। প্রথম দুই পর্বের পর 'চিকিৎসাগবেষণা' পর্বের উপস্থাপনা একটু খাপছাড়া লাগলেও এটির গুরুত্ব অপরিসীম।

এত ছোট একটি বইতে যদিও প্রয়োজনীয় সব কিছু পাবার আশা করা উচিত নয়, তবুও হেহেতু বইটির পরিপ্রেক্ষিত নতুন এবং প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন, দু-একটি বিষয়ের অভাব অনুভূত হতে পারে। 'জনস্বাস্থ্যের' পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের গ্রাম-শহরের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক, কিন্তু জাতীয় ভেষজ-নীতি বা স্বাস্থ্যনীতির প্রয়োজনীয়তার কথাটি তুলে ধরেন নি। উৎসর্গপত্রের 'দেশে বিদেশে জনস্বাস্থ্যের আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, দেখা-অদেখা সেই সব সংগ্রামী বন্ধুকে' লেখক একটু পরিচিত করাতে পারতেন না কি পাঠকের সঙ্গে? ঘরের পাশের বাংলাদেশের নতুন ওষুধ-নীতি যে আলোড়ন তুলেছে তার একটু আলোচনা বইটিকে সমৃদ্ধ করতে পারতো। স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন লোকায়ত ধ্যান-ধারণার আলোচনাও হতে পারতো বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তবে এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে বইটির গুরুত্ব কোনভাবে খাটো করা যায়। প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের পড়ার মত একটি বই 'বিষয় জনস্বাস্থ্য'। দাম আর একটু কম হ'লে অবশ্য ভালো হতো।

প্রদীপ দত্ত

রিপোর্ট

ভারতের করিগরী নীতি প্রসঙ্গে

1983 সালের 3 জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তিরুপতিতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সত্তরতম অধিবেশন উদ্বোধন করার সময় ভারত সরকারের কারিগরী নীতি Technology Policy Statement প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার 35 বছর পর 16 পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় অর্থনৈতিক স্বাধিনতা অর্জন, দারিদ্র দূরীকরণ, জনগণের আশা আকাংখার সাথে কারিগরী উন্নয়নকে যুক্ত করা, কারিগরী ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা লাভ করা, দুর্বলতর জনগণের অবস্থার দ্রুত উন্নতি করা এবং পশ্চাদপদ অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে।

সেন্ট্রাল গ্লাস এ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ও CSIR SWA—CGCRI শাখার যৌথ উদ্যোগে কিছুদিন আগে এই Technology Policyর উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পোন্নয়ন, দেশীয় কারিগরী উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মৌলিক সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী নীতির মূল্যায়নের প্রয়াস পান। একজন বক্তা বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—(ক) এ পর্যন্ত দেশে অর্থনৈতিক যেসব নীতি গৃহীত হয়েছিল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলির ব্যর্থতার কারণ যথাযথভাবে পর্যালোচনা না করেই কারিগরী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। (খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ছাড়া কারিগরী নীতি কার্যকর করা সম্ভব নয়। (গ) কায়েমী স্বার্থের চাপে দেশী কারিগরী থাকা সত্ত্বেও প্রায়শই বিদেশী কারিগরী আমদানী করা হয়ে থাকে।

আর একজন বক্তা বলেন—Technology Policyর লক্ষ্যগুলি আদৌ নতুন নয়। বহুবার নানাভাবে এসব প্রচার হয়েছে। একদিকে আত্মনির্ভরশীলতার কথা বলে Technology Policy ঘোষিত হচ্ছে—আবার একই সময় সর্বাধিক বিদেশী সাহায্য- পুঁজি ও কারিগরী আমদানীর চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। এই দুমুখো নীতি থেকেই এই পলিসি স্টেটমেন্টের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করা যায়। কারিগরী নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণের পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন। পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করে দেশের প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ এবং কারিগরী দক্ষতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণাগারগুলির কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ, পুনঃ পুনঃ বিদেশী কারিগরী চুক্তি নিষিদ্ধ করা, সামরিক ব্যয়ের মাত্রা কমিয়ে উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, গবেষণাগারগুলিতে আমলাতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রস্তাবের মূল বিষয়।

অন্যান্য বক্তারাও ঘোষিত কারিগরী নীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশংকা ব্যক্ত করেন। আর একজন বক্তা বলেন—উন্নত দেশের অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যের ফলে উদ্ভূত অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি গভীর সংকটে পড়ছে।

পরিশেষে সভায় বিদেশী সাহায্য ও কারিগরী আমদানী নিষিদ্ধকরণ, দেশীয় কারিগরীর বিকাশ ও প্রয়োগ, জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সার্বিক উন্নয়ন ভিত্তিক শিল্পনীতি প্রণয়ন, গবেষণা সংকোচন নীতির অবসান ও গবেষণাগারের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও শাসনতন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন প্রভৃতি দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তা প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সি. জি. সি. আর. আই.র **শ্রীসূর্য নিয়োগী** প্রেরিত রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরী।

খোঁজ খবর

মানস

এই অসুস্থ সমাজে মনের দিক থেকে আমরা কেউই সুস্থ নই। মনের রোগে শক নয়, ব্রেন সার্জারী নয়, চাই মনের সাহচর্য। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীট ও সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছে মডার্ন স্কুল (নতুন বাড়ী) 17 বি, মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড কলি-17য় আপনিও যোগ দিন। মনোরোগ, মনোচিকিৎসায় একটি নতুন পথের খোঁজে।

স্লাইড প্রোজেকটর

অনধিক দু'শ টাকার মধ্যে স্লাইড প্রোজেক্টর ও মাইক্রোফোন সিস্টেমের (পি. এ. এস.) জন্য যোগাযোগ করুন ঃ সি. ও. এ. এস. টি., প্রযত্নে—সলিল কুমার ঘোষ, 12/1 রাজা মনীন্দ্র রোড, কলকাতা-700037 (পাইক পাড়া বাস স্ট্যান্ডের কাছে,।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় : গ্রন্থাগার

গণশিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় মাধ্যম গ্রন্থাগার। তাই বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়—শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য জীবিকাশ্রয়ী মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সবরকম সাহায্য করে আসছে।

গত ছ'বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৬২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১০ টি। এই সময়ে রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জেলা, মহকুমা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক অনুদান পাঁচ হাজার, দশ হাজার এবং চার হাজার টাকা করা হয়েছে।

১৯৭৯ সালে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইন এবং পরবর্তীকালে এই আইনের কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার-গুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে একটি পৃথক গ্রন্থাগার অধিকার এবং রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। পাঠক সাধারণের সামাজিক চেতনা, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করছে এই গ্রন্থাগারগুলি।

সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, জনগণের অফুরন্ত জিজ্ঞাসার জ্ঞানভাণ্ডার এই গ্রন্থাগার। অজানাকে জানার জন্য শিশু মনের অপরিসীম আগ্রহের কথা স্মরণ রেখে রাজ্য সরকার সম্প্রতি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৩৭ টি পাঠাগারে শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশুদের জন্য এরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অভিনব।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সমাজসেবী মানুষের উপর এক গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। সকলের প্রয়াসে গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবাহারের সাহায্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

—আই. সি. এ-৩৬১/৮৪—

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি নতুন বই

1. **নানা চোখে ঋষি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র**
   সম্পাদনায় দেবব্রত ভট্টাচার্য ও অজয় চক্রবর্তী
2. **বিদ্যুতের রূপকথা**——অজয় চক্রবর্তী
3. **বিজ্ঞান-মনীষা গ্রন্থমালা**
   সম্পাদনায় : অজয় চক্রবর্তী এবং মনীন্দ্র ঘটক

এ গ্রন্থমালায় প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হবে বারোটি বই ঃ (i) আচার্য জগদীশচন্দ্র (ii) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (iii) অচার্য সত্যেন্দ্রনাথ (iv) অধ্যাপক মেঘনাথ সাহা (v) ডাঃ নীলরতন সরকার (vi) টমাস্ আলভা এডিসন (vii) স্যার আইজাক নিউটন (viii) মাইকেল ফ্যারাডে (ix) মাদাম কুরী (x) চার্লস ডারউইন (xi) গ্যালিলি গ্যালিলিও (xii) লুই পাস্তুর।

পুথিপত্র

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

বিশুদ্ধ খাবার জলের জন্য ব্যবহার করুন

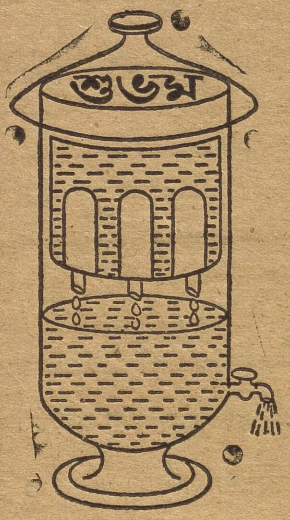

শুভম ফিল্টার

পোড়া মাটির তৈরী আধার।
দু'সাইজে পাওয়া যায়
১৮ লিটার (২টি ফিল্টার)—১৩/-
২৫ লিটার (৩টি ,,)—১৭৫/-
বাড়ীতে ডেলিভারী দেওয়া হয়
ডেলিভারী চার্জ স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—
রাহা এন্টার প্রাইজ
'রাহা ভিলা'
নেতাজী সুভাষ রোড (নতুন বাজার)
পোঃ—চুঁচুড়া ; জিলা হুগলী

প্রকাশিত হল

পরমানু যুদ্ধ অস্ত্র এবং যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন বিষয়ে বিশদ তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা

না হিরোশিমা নাগাশাকি চাই না

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ে নানান প্রশ্ন ও বিতর্ক নিয়ে আলোচনার সংকলন

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

কলকাতা বইমেলায় "উৎস মানুষ" স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া যে সমস্ত স্টলে "বিজ্ঞান বিজ্ঞানকর্মী" বিক্রি হয় সেখান থেকেও পাবেন। দাম যথাক্রমে পাঁচ টাকা ও চার টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

ELECDROLIK ENGINEERING COMPANY

Sri Aurobindo Road, Ramrajatala

Phone : 67-2017 Gram : SPOOLVAL, Satragachi

MANUFACTURERS OF :

PORTABLE OIL HYDRAULIC EQUIPMENT, viz :

Hydraulic Floor Crane capacity 1-2 tonnes, Hand/power operated Hydraulic Comrpessor jointing of ACSR conductor capcity 100 tonnes. Power operated 2 stage High Pressure Pump Unit 600 Kg/cm^2. Haud operated Pump Unit upto 800 Kgcm^2. Lever operated spool type Directional Valve with iu-built pilot operated Check valve. Hand power operated Hydraulic Clamp Vice capaciiy upto 10 tonnes.

বিশটি দফায়
দূর হবে ক্লেশ
শিক্ষা-স্বাস্থ্যে
ভরবে দেশ
83/378

R.N.34929/79

YEAR 7 NUMBER 5

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
C/o D.S. Enterprise,
52/9C B.B. Ganguli Street, Calcutta-12
MARCH-APRIL 1984

আগামী সংখ্যার ঘোষণা

বি-ও-বি-র আগামী সংখ্যায় আমরা চেষ্টা করছি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ধরে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা ও বক্তব্য রাখতে। বিষয়—

ধর্ম ও কল্পভাবনা

(রিলিজিয়নস, মিথস, ফল্‌স কনসাশনেস)।

এই বিষয়ের উপর আলোচনাকে সার্থক করে তুলতে সকলের সাহায্য চাইছি। আপনার সুচিন্তিত লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন। বিষয়টি দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ বলেই হয়ত আগামী সংখ্যা প্রকাশে কিছুটা দেরী হতে পারে। বর্তমান সংখ্যায় ঘোষণামত মনোরোগ 'চিকিৎসা'য় ওষুধ বিষয় লেখাটি না নিতে পারায় দুঃখিত।

পড়ুন ও পড়ান

☐ উৎস মানুষ ☐ প্রগতিবার্তা (কল্যাণী) ☐ বিজ্ঞান মণীষা (মেদিনীপুর) ☐ অঙ্কুরে শুরু ☐ লোকবিজ্ঞান (কাশীনগর) ☐ অন্বেষা ☐ অহল্যা ☐ গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) ☐ Manushi (দিল্লী) ☐ Parents and Pedagogues (উড়িষ্যা) ☐ Science for the People (USA) ☐ Medico Friends' Circle Bulletin (পুণে) ☐ জনবিজ্ঞান (আসাম)।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুস্তিকা

☐ মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে ('উৎস মানুষ' ও 'মানস' এর যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত, যোগাযোগ P 239 A কিষ্বার স্ট্রীট, কলিকাতা—700017) ☐ কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, 23, চাঁদমারী রোড, কাঁচরাপাড়া) ☐ মালা বাড়ে রোগ সারে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (উৎস মানুষ, বি ডি 494 সল্ট লেক, কলি64) ☐ গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন, একটি প্রাথমিক খসড়া—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক বি6/119 কল্যাণী, নদীয়া থেকে প্রকাশিত) ☐ পরিবেশ দূষণ—স্বপন কুমার শীল (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার) ☐

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী কোথায় পাবেন

☐ কলেজ স্কোয়ারের বইয়ের দোকান 'কথাশিল্প' 'বুকমার্ক' 'পিপ্‌ল্‌স বুক সোসাইটি', বুক্‌স অ্যাণ্ড নিউজ ☐ শিয়ালদহ নর্থ স্টেশন ☐ বি বি ডি বাগের স্টল 'ছাড়পত্র' 'এমা' ☐ শ্যামবাজার ও রাসবিহারী মোড়ের স্টল ☐ রাজা রামমোহন রায় সরণী, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উল্টোদিকের বইয়ের দোকান 'নবসাহিত্যপ্রকাশনী' এবং অন্যান্য।

রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে গীতা প্রিণ্টার্স, ২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত